ভাবমুখে

জ্যৈষ্ঠ ● তেরশ' নব্বই ● সপ্তত্রিংশ বর্ষ
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ী

ভারতের মোটর পার্টস্ ব্যবসায়ে
একটি ঐতিহ্যপূর্ণ বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী
– লিমিটেড –

রেজিষ্টার্ড অফিস—১৬৫, শরৎ বোস রোড
ক লি কা তা - ২৬
প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্র নাথ মুখার্জি রোড
ক লি কা তা - ১
অন্যান্য শাখা—দিল্লী ✦ কটক ✦ ধানবাদ ✦ পাটনা ✦ শিলিগুড়ি ✦ গৌহাটী

▣

DRINK

ORPHAN'S TEA

For

HEALTH & ECONOMY

ORPHAN TEA SYNDICATE

133 Cornwallis St., Shyambazar

Phone : 55-2704

ফোন : ৩৪-৭১০৮

এন্, কে, স্পোর্টস্

৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

যাবতীয় খেলাধূলার সরঞ্জাম এবং কাপ শীল্ড ইত্যাদি বিক্রেতা বিভিন্ন ক্রীড়ামোদী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান।

✲

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত বিদ্যাপীঠ সমূহের যাবতীয় প্রয়োজনীয় খেলাধূলার সরঞ্জাম আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

"মানুষের মাঝে মানুষ রতন আছে"—শ্রীশ্রীঠাকুর

D. RATAN & Co.
Photographers PHOTO
22-1, CORNWALLIS ST, CAL. 6
PHONE : 34 - 5711

ডি. রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফোন ৩৪-৫৭১১
ফটো
২২-১, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি-৬

জ্যৈষ্ঠ
দ্বিতীয় সংখ্যা

সপ্তত্রিংশ বর্ষ
তেরশ' নব্বই

ভজন	৩১	শ্রীশ্রীঠাকুর
সম্পাদকীয় নিবেদন	৩২	
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্য	৩৩	শ্রীঅর্চনাপুরী
বিজ্ঞানী ঠাকুর সত্যানন্দ	৩৫	সাধনাপুরী
ভগবান আদি শঙ্করাচার্যের দৃষ্টিতে কর্ম	৩১	শ্রীআর. বেঙ্কটরমণ্ (অনুবাদ— পুলিন মুখোপাধ্যায়)
পৃথিবীতে একদিন	৪২	নচিকেতা ভরদ্বাজ
তবু ভালো লাগে	৪২	ডাঃ গোবিন্দ চক্রবর্তী
তবু তাকে পেতে চাই	৪৩	শান্তশীল দাস
কথামৃত-কথায় সত্যানন্দ সন্ধান	৪৪	স্বামী বোধানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসঙ্গী মহেন্দ্রমাষ্টার "মঙ্গল মালিকা"	৫৩	শ্রীসত্যীনচন্দ্র নাথ
গান	৪১	শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

'ভাবমুখের নিয়মাবলী'

ভাবমুখে সিউড়ী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের মুখপত্র

বর্ষারম্ভ বৈশাখ মাস। বর্ষের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়, কিন্তু কমপক্ষে ৬ মাসের গ্রাহক হলে সুবিধাজনক হয়। বার্ষিক চাঁদা বছরের প্রথমেই অগ্রিম দিতে হইবে।

বার্ষিক মূল্য সডাক টাঃ ১৪'০০। ষাণ্মাসিক টাঃ ৭'০০। (বাংলা ১৩১০ সাল হইতে)

রচনা : ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশ হইয়া থাকে। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠান প্রয়োজন। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। কোন রচনা প্রকাশ করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপেক্ষ। সমালোচনার প্রয়োজন হইলে দুই কপি করিয়া পুস্তক প্রেরণ করা আবশ্যক।

বিজ্ঞাপন : বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পূর্বমাসের মধ্যে পাঠাইলে উহা পরবর্তী মাসে প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জানিতে পারিবেন।

বিঃ দ্রঃ গ্রাহক গ্রাহিকাগণের প্রতি নিবেদন এই যে, পত্রিকা উপযুক্ত সময়ে না পাইলে সর্বপ্রথম স্থানীয় ডাকঘরে সন্ধান লইবেন এবং পরে অফিসে জানাইবেন। পত্রাদি লিখিবার সময় গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করিবেন।

কোন গ্রাহক-গ্রাহিকা ঠিকানা পরিবর্তন করিলে উহা পূর্ববর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে কার্যালয়ে জানান আবশ্যক।

বার্ষিক চাঁদা বৈশাখ মাসের মধ্যে মনিঅর্ডার যোগে, গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা মনিঅর্ডার ফর্মের সর্বনিম্ন ঘরে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া "স্বামী পরমানন্দ, ভাবমুখে সচিব, ২, পি. কে. সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬" (ফোন : ৫২-৭১৩৩) এই ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, সকল রকম শীতের পোষাক, বেনারসী, সিল্ক, উাতবস্ত্র
মিলবস্ত্র সর্ব্বপ্রকার তৈয়ারী পোষাক, ছোসিয়ারী ও আধুনিক ডিজাইনের
ডেকরণ টেরিলিন, ট্রিপিল ও ওয়াস্ এণ্ড ওয়ার শাড়ী বিক্রেতা।

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

বড়বাজার, কলিকাতা-৭ ফোন : ৩৩-২৩০৩

Electrical Motor, Double Ended Grinder, Polishing & Buffing, Flexible Shaft Grinder Etc.

MANUFACTURED BY

RAMKANAI ELECTRO WORKS

26'2, PRIYANATH MIDDYA ROAD. (Belgharia)

CALCUTTA-700056. *Phone* : 58-1575

With best compliments from :

RELIABLE ENGINEERS & TRADERS

25, Harachandra Mullick Street,

Calcutta-700005

Gram : *DISWASHING*　　*PHONE* : { *Office* : 24-1236 / *Works* : 55-1738

PELICAN ENGINEERS

Fabricators of Stainless Steel Chemical Plants,

Pharmaceutical & Fruit Preservation Equipments.

4, HARTFORD LANE. CALCUTTA-700016.

Works : 161, Upper Chitpur Road,

Calcutta-700005

ভজন্	অরুণ মুখোপাধ্যায়
সত্যানন্দ তীর্থের সন্ধানে	অরুণা মুখোপাধ্যায়
গান	শ্রীশরণাপুরী
তত্ত্বজ্ঞী আঁখে ধাঁধা লাগতো (২৭)	বঙ্গানুবাদ
অষ্টম ঘটনের অলৌকিক রহস্য —উত্তরণের দীক্ষা	শ্রীনরেন্দ্র নারায়ণ বাগচী
আশ্রম সংবাদ	
Bengal Down The Ages	
Reama Anasasakthi Yoga	
The Universal cripture　　8	V. Ganesh Rav

স্বামী সত্যানন্দদেবের দুটি নতুন বই

কথামৃত-কথা

- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের কিছু বাণীর আধুনিকযুগসম্মত ব্যাখ্যা।

মূল্য : আট টাকা

সাধুর চলার পথে—

- দৈনন্দিন জীবনে মানুষের লক্ষ্য পথে চলার নির্দেশনা।

মূল্য : ছয় টাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন,
২, পি, কে, সাহা লেন,
কলিকাতা-৭০০০৩৬

ভক্তগণের বহুদিনের প্রতীক্ষিত ও আকাঙ্ক্ষিত সদ্য প্রকাশিত

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেবের জীবনী গ্রন্থ

ক রু ণা ব তা র

শ্রীশরণাপুরী　　মূল্য : ১৬·০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২, পি. কে. সাহা লেন, কলিকাতা-৭০০০৩৬

শ্রীরামকৃষ্ণপদ ভরসা

৺রামাপদ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত

নারিকেলডাঙ্গা রোলার ফ্লাওয়ার মিলস্

১৭/৪, কেরেল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা-৯

স্থাপিত ইং ১৮৮৮ সাল

৯৫ বৎসরের

জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৩৫-৪১২৪
৩৫-৪১২৫

। স্বত্বাধিকারী ।

রথীন্দ্রনাথ ঘোষ এ্যাণ্ড ব্রাদার্স

সদ্য প্রকাশিত

"বাংলা সাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব"

স্বামী নীলানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্য জগতে একটি মূল্যবান অবদান

মূল্য : পঁচিশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, নিউড়ী, বীরভূম

শ্রীসত্যানন্দ দেবায়তন, ১ ইব্রাহিমপুর রোড, কলিকাতা-৩২

* আশ্রম পর্ব্ব পঞ্জী : শ্রাবণ, ১৩৯০

২০শে জুলাই, বুধবার — একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম।
২৫শে " রবিবার — গুরুপূর্ণিমা। সকালে হোম।
১লা আগষ্ট, মঙ্গলবার — কৃষ্ণাষ্টমী আমাদের সত্যস্থাপিতা শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের তিরোধান তিথি। এদিন আশ্রম অন্তেবাসিগণ উদয়াস্ত উপবাস ও মৌনব্রত অবলম্বন ক'রে হোম, জপ ও স্বাধ্যায়ে নিযুক্ত থাকবেন।
— একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম।
— রাত্রে অমাবস্যার হোম।

* বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে।

57-4562

TRINAYANI ELECTRIC Co.

Engineers & Govt. Licenced Contractor

145, LAKE TOWN, Block—'A'
CALCUTTA-700085

মডার্ণ ডেকরেটর্স

শুভবিবাহ ও যে কোন উৎসবের
প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫এ, ডব্লু, সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলি-৬

ফোন : ৫৫-২৫৪৯, ৫৫-৬৫৬৫

N. G. Chakrabarti Alloy Steels (P.) Ltd.

INCORPORATING

N. G. CHAKRABARTI & CO.

Manufacturers of :

1. Alloy Steel Castings
SUCH AS
Nickel Chrome Steels
Heat Resisting Steels
Stainless Steels
Austenitic Manganese Steels
Made In
Induction Furnace.

2. Alloy Iron Castings
SUCH AS
Heat Resisting Alloy Iron Castings
High Duty Iron Castings
NIHARO Castings
Graded Iron Castings
OF
All Special Grades & Sizes

3. Direct Arc Electric Melting Furnaces
For Melting all Grades Steels,
Alloy Steels & Alloy Iron etc.

MIN MODEL	MAXI MODEL
SR-1—150 Kgs. Batch	SR-4—1000 Kgs. Batch
SR-2—250 Kgs.	SR-5—3000 Kgs.
SR-3—500 Kgs.	SR-6—5000 Kgs.

●

Quality Guaranteed

Works

K-65, Howrah Industrial Estate,
P.O. Balitikuri
Howrah, (*West Bengal*)
Telephone : 69-2890

Head Office :

3D, Nandy Street.
Calcutta-700029
Phone : 42-5197
Cable : "ENGEECEE"
Calcutta

প্রতিষ্ঠাতা : শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেব

সপ্তত্রিংশ বর্ষ	তেরশ' নব্বই	জ্যৈষ্ঠ	দ্বিতীয় সংখ্যা

ভজন

শ্রীশ্রীঠাকুর

ভয়রহীন জ্যোতির জ্যোতি
চিন্ময় চিরধাম
শোকবিহীন শান্ত স্নিগ্ধ
বাসনার নির্ব্বাণ।
বন্ধনহীন আনন্দঘন
সত্য সুন্দর শিব
দিবস রাত্রি কাল পারাবার
সেবার স্বর্গে বিরাম।
মন বুদ্ধি অহংকারে
অপ্রাপ্য যে পদ
অস্তি মাত্র উপলব্ধ
অনাময়-অনামী।

—::—

সম্পাদকীয় নিবেদন

[সপ্তত্রিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯০]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের মুখপত্ররূপে 'ভাবমুখে' পত্রিকা বর্তমান বঙ্গাব্দের শুভ বৈশাখে সপ্তত্রিংশ বর্ষে উপনীত হয়েছে। নববর্ষে, এই পত্রিকার সুহৃদ পাঠক পাঠিকা, অনুরাগী ও সহায়ক ব্যক্তিবর্গের সকলকে আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। কল্পতরু ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা, তিনি সকলের মঙ্গল বিধান করুন।

সংঘগুরু শ্রীশ্রীসত্যানন্দদেব বলতেন, তোমরা কুশলে থেকো, শান্তিতে থেকো। কি সংঘজীবনে, কি পারিবারিক জীবনে সকলেই পরস্পর প্রীতিযুক্ত হয়ে চলবে। তাদের মধ্যে বিসদৃশতা অন্তর্হিত থাকবে, এই তাঁর কামনা ছিল। সমস্যা-সঙ্কুল বর্তমান সমাজে আজ কুশলতা যখন সহজ প্রাপ্য নয়, শান্তি যখন সহজ-লভ্য নয়, তখন তাঁর সেই বাণী বারংবার মনে পড়ে। আর মনে হয়, ধর্মজীবন ও সমাজজীবনের মধ্যে সুসঙ্গতি আনার জন্য কতো অমূল্য উপদেশ দিয়ে গেছেন তিনি। ধর্মমুখী জীবন-যাপনের আদর্শ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সংঘনীতি কতো সুন্দর ভাবে রচিত হয়েছিল সংঘগুরু কর্তৃক। পুরাণো দিনের সেইসব কথা ও কাহিনী, বিশেষতঃ ভাবমুখে পত্রিকার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত উদ্দীপনাময় রচনাবলী, যেন শান্তি ও কুশলকামী মানুষের মানসপটে বারেবার উদিত হয়।

লোকশিক্ষার এক উপযোগী মাধ্যম রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভাবমুখে পত্রিকা। এর প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং সত্যানন্দদেব। তাই, 'ভাবমুখে'-র ক্রমবিকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে আছে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ইতিবৃত্ত। ১৩৩০ বঙ্গাব্দের গুরুপূর্ণিমা তিথিতে ভাবমুখের প্রথম আত্মপ্রকাশ। ঐ বর্ষে আর একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথিকা' এই নামে। তারপর, ১৩৩৩ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ থাকে অনিবার্য কারণে। পুনরায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ হতে নিয়মিত মাসিক পত্রিকারূপে 'ভাবমুখে' প্রকাশিত হয়ে আসছে। পত্রিকাটি'র বয়ঃক্রম সেইভাবে নির্ণীত এবং সেই হিসাব অনুযায়ী ভাবমুখের বর্তমানবর্ষী বর্ষ উদ্‌যাপিত হয় ১৩৭১ বঙ্গাব্দে।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সূচনা হয় ১২৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে; যদিও এই সংস্থা বিধিবদ্ধ সংঘরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৩৫২ বঙ্গাব্দে। সুতরাং সেই দৃষ্টিতে ভাবমুখে পত্রিকাকে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রায় সমসাময়িক বলা চলে।

আশ্রম-রচিত প্রথম বিধি-পত্রে বর্ণিত আছে, কোন্ উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত এই সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ কর্তৃক। উদ্দেশ্য-ত্রয়ের প্রথম দুইটি এরূপ :

(১) 'Development of religious literature' অর্থাৎ ধর্মমূলক সাহিত্যের সৃষ্টি ও বিকাশ।

(২) 'Culture of scientific and practical religion', অর্থাৎ বিজ্ঞানভিত্তিক ও বাস্তব রূপায়ণযোগ্য ধর্মের অনুশীলন।

আর, সংঘের উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক যে সকল নিয়মাবলী বিধিবদ্ধের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তার প্রথমটি এরূপ :

'Immutable and inviolable rule or rules of the Society is the propagation of the truth and beneficience of Ramakrishna Cult Name and Person. অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারা, তত্ত্বাদর্শ ও তত্ত্বাধারের মধ্যে যে-সত্য ও কুশলতা অন্তর্নিহিত আছে, তার সম্যক প্রচার হচ্ছে এই সংঘের অপরিবর্তনীয় ও অলঙ্ঘ্য নীতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের মুখপত্রে সেই নিয়মনীতি ও

[সম্পাদকীয় নিবেদন—সেখানে ৩১ পৃষ্ঠায়]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্য

শ্রীঅর্চনাপুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্নিগ্ধ লহর মৃদুল সমীর ছড়িয়ে পড়ে রাত্রি দিন
আলিঙ্গনে মুগ্ধ কমল সরসী
প্রহরগুলি রঙ্গীন হ'য়ে নিস্তরঙ্গে স্বপ্নলীন
পরাগ বাসে লগ্ন অনুপম।

ঘুমিনপুরের সন্ধ্যারাগে নিত্য কাঙন রৈজোলি
সরিত বুকের শীকর পরিমলে
দিগ্বনিতার সিন্দুরেতে ইন্দ্রধনুর বর্ণালী
জড়িয়ে দিত সন্ধ্যাতারা ভোলে।

আলোর পাগল সেই নয়নে সজল আভা লাগলো কি
কয়টি দিনের আসন্ন বিচ্ছেদে
নিবিড় নীল অক্ষির ভ্রূ অভিমানে কাঁপলো কি
পাতার কপোল ভিজলো অশ্রু খেদে।

এবার প্রভুর যাত্রা শুভ তীর্থ রেণুর সন্ধানে
গৌড় ভূমের নবদ্বীপের পথে
সোসর শুধু থাকবে সাথে, সেবা প্রীতির বন্ধনে
চপল চরণ সেই তো রাখে বেঁধে।

দাক্ষায়ণীর বাসন্তীমুকের রঙ্গী মধুর দেও আনে
নাশিয়ে সেবার পূর্ণ উপচার
সমারোহের রাজসূয় যোগ নিত্তি তাহার সব কাজে
সার্থক নাম শুদ্ধ রসদার।

স্বর্ণ অলস লগ্নে সেদিন একটি তরী দেয় দেখা
গঙ্গবহ পূণ্য সলীলে
নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে লাগলো যে মাও চেউ লাগা
সন্ধ্যা উষার সাগর সঙ্গমে।

তরী হ'তে উত্তরিল নবীন গৌরা গদাধর
তীরের চোখে অবাক বিহ্বলতা
গৌর গদাই রূপটি দেখে শুরুভারাটির হিয়ার পর
জাগলো যেন কোমল আকুলতা।

এই তো সোনার সেই মহীয়া প্রভুরও চোখ সন্ধানী
খুঁজছে শুধু ফুল ঝরা সেই দিন
পথের বুকে অঙ্গ তখন বৈয়াগীটির খঞ্জনী
দিগন্তিকায় ফুরোনী হয় ক্ষীণ।

নিখর বালুচরের বুকে বাহিত কোন চরণ চিন্
আজকে যেন পলাতকার স্বপ্ন
ঘুমিয়ে গেছে হংসমণি নূপুর দুটি অনেকদিন
আজও কি তার হয়নি জাগার লগ্ন?

ঝলমলিয়ে উঠলো প্রভুর বিষাদ কাজল চোখ দুটি
কি যেন হায় হারিয়ে গেছে কোথা
দেয় না তো কেউ হারিয়ে যাওয়া মঞ্জীমালার গন্ধটি
বিষ্ণুপ্রিয়ার শেষ বিদায়ের কথা।

শচী মায়ের নিশির প্রদীপ বাতায়নের ভোর বায়ে
সেই ঘুমালো আর জাগে না কেন
মায়ের বুকের কান্না খুঁজে বলতুলসীর ধূপছায়ে
প্রতিধ্বনি কাঁদছে একা যেন।

তীর্থে এসে এমন কেন উদাস প্রভু রাত্রিদিন
বুঝতে নারে আজকে গুরুরায়
হয় না কেন তাদের আবেশ হয় না আঁখি অঞ্জনীন
এমন কেন হ'ল প্রভুর প্রাণ।

সবারোহের নাই তো ত্রুটি ভাবরে মধুর হায় গো হায়
তবু প্রভুর আনন্দ নাই মনে
সদাই যেন ভাবরে কিছু পাইনা কি মন যেটুক চায়
দিব্যভাবের এমন সময়ে।

সকাল সাঁঝে তীর্থ দেউল পরিক্রমায় দিন কাটে
পঞ্চদীপের আলোক নিখিল বেলা
প্রভুর দুটি নিথর আঁখি হারিয়ে যাওয়া কোন নাটে
খুঁজছে কোথায় চলছে দিব্যলীলা।

সাঁঝের মণি চুমকি জ্বালা নীল গগনের চন্দ্রাতপ
সুরধুনী উজান চোখে চায়
মৃদু ঘাটের পৈঠা পরে ওঘরে ওঠে ঝিল্লি রব
মনের চাঁদের অস্ত জোছনায়।

শ্রীবাস আঙন নিথর কেন চৌদ্দ মাদল কই বাজে
কইগো আটাশ করতালের ধ্বনি
নিকুঞ্জ নগর আঁধার কেন কীর্ত্তনে আজ কই নাচে
শচীর দুলাল গৌর গুণমণি।

বিষাদ বুকে ভাবছে প্রভু নিত্যলীলায় নদীয়ায়
চুকলো কেন লীলার মহোৎসব
বৃথাই তবে মরি খুঁজে ? কল্পকথা সব কি হায় !
নিত্য ব্রজে লীলার পরাভব ?

গোধামীদের পূণ্য তখন শুকনো ফুলের আলপনায়
পথ চেয়ে কার প্রহর ওঠে কাঁপি
মৃদু আঙন প্রভুর চোখে যেমন রাতের মেঘ ঘনায়
এলেন ফিরে বুকের ব্যথা চাপি।

সেই বিরহী মধুকরের সদাই ছিন্না উন্মনা
কয়েকটি দিন কাটলো কোন মতে
কেয়ার পাড়ি ধরলো মধুর আঙতে মন আর চাইল না
ভাসলো তরী তরা নদীর স্রোতে।

দুলিয়ে আলোর উদ্ভিমালা সুরধুনী উজলা
দূরের তীরে শ্যামল চিত্রলেখা
খেয়ার পালে আকুল করে দূর বনিমা ছেলা
কোন বলাকা উধাও পলাতকা।

কেউ মরালীর ভঙ্গী তুলে ঐ তরণী যায় ভেসে
বক্ষে ল'য়ে বিদায় বিধুর ব্যথা
সোঙন চাঁদের অস্ত ছিবি সজল মনের কোন দেঁশে
জড়িয়ে কাঁদে শ্রান্ত মালার লতা।

অক্ষ উদাস ভাষায় ভরা প্রভুর দুটি নীল আঁখি
ঝুঁকিয়ে পড়া দিগলয়ের পানে
নিবিড় হ'য়ে হারিয়ে গেছে তীরের পথও যায় বাঁকি
পাগলা তরী বই খোঁজে মাঝ গাঙে।

আমরা সবুজ কান্না যেন দূরের বন বনান্তর
বৈঠা ধারে মর্ম্মরিছে ঢেউ
প্রভুর বুকের গুপ্ত প্রহর কোন অমিলে ধেয়ানের
মৌন যেমন বুঝতে নারে কেউ।

এমন উদাস নর্ম্ম বেলা কাটছিল যেন মধুরে
ভাবসাগরে নিথর গভিরাগ
চকিত উদাস জাগলো হঠাৎ প্রভুর রূপের নির্ঝরে
লক্ষ নদীর উপল ভাঙা জাগ।

দেখেন ঠাকুর আকাশ পথে উধাও নাচের ভঙ্গীতে
আসছে ছুটে আলোর শিশু দুটি
চাঁচর চুলের ভ্রমরগুলি পারিজাতের সঙ্গীতে
চাঁদ কপোলে পড়ছে যেন লুটি।

ফাগুন রাতের জ্যোৎস্না বিলাস অস্ফুট অধর বন্ধনে
আপনা ভোলা ভাবের দুটি আঁখি
প্রভুর পানে একটু চেয়ে দিব্য তনুর লজ্জনে
মিলিয়ে গেল আবেশটুকু রাখি।

ঐ এলরে এলরে ঐ ওঠেন প্রভু ওজরি
ভাবসাগরে হারিয়ে গেল বাণী
কমল মুঠি খুলে তুলি শুভ্র হয়ে মধুরি
শান্ত সমাধির আবেশ এল নামি।

দিবা তবু রক্ষিতে তাই যাত্ত হ'ল ছলনায়
শুভ মধুর বিস্ময়েতে মুগ্ধ
দুর্যোগেরই এই আঁধারে হঠাৎ কেন জাগলো প্রাণ
একটু বুঝেই উঠলো ভ'রে বুক।

হারিয়ে গেছে আবাবতী বুক্তিকুলের স্বপ্ন গো
মহাকালের সাগর সলিলে
হায় নদীরা তেমনি বুঝি গঙ্গাবুকে মর গো
জাগলো প্রভুর দিব্য পরশনে।

পৌষ নিশাই এক হ'ল আজ ফাল্গুনেরই রূপ দেখায়
চৈত্রেরই আসন হ'ল বন্ধ
হায় পথিকের দেবতো কি আজ একেই যে সব একই হায়
ফিরলো মধুর মিছে ভরা পণ্য।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানী ঠাকুর সত্যানন্দ

সাধনাপুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অবতারকল্প-ভক্ত ভগবানের মিলন মেলা বসেছে সিউড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রাঙ্গণে, ভক্ত একজন প্রশ্ন করল শ্রীঠাকুরকে 'ভক্ত বেশী ভালোবাসে না ভগবানই ভক্তকে বেশী ভালোবাসেন ?'

শ্রীঠাকুর অতি সহজ ভাবেই বিজ্ঞানীর বুদ্ধি শুদ্ধী দিয়ে প্রশ্নটির উত্তরে বললেন 'ভক্ত ভগবানের ভালবাসা সমান 'তুম আগেসা রাম পর, তুম পর তাইসা রাম', কখন ভক্ত হন চুম্বক, কখন বা ভগবান চুম্বক হয়ে ভক্তকে টানছেন ; ঠাকুর যদি বেশী ভালোবাসেন তাহলে ভক্তকে তো তখনি বুকে টেনে নিতেন তাহলে তো লীলা চলেনা, প্রলয় হয়ে যেত, আর তাছাড়া ভক্ত-ভগবান কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। বিজ্ঞানের নিয়ম—each action has an equal and opposite reaction. প্রত্যেক শক্তির পেছনে ঠিক সেই রকম একটা বিপরীত শক্তির খেলা দেখা যায়। কাজেই ভগবানের টান যতটুকু ভক্তের টানও ততটুকু হবে। (শ্রবণ মঙ্গলম্ ১ম খণ্ড-১৭)

একদিন শ্রীঠাকুর আমাদের সকলকে Four dimension এ ধ্যান করতে বললেন। এই Theory নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে বিশেষ আলোড়ন চলছে শ্রীঠাকুর ও সে কথা পড়েছেন তাই আমাদের বললেন।

Four dimension এ ধ্যান কর। প্রথম হচ্ছে বিরাট ঠাকুরের মূর্তি, বিরাট হতে বিরাটতরো হয়ে উঠছেন। দ্বিতীয়ত প্রতি অণু পরমাণুতে সর্বত্র ঠাকুর, ওতপ্রোতভাবে রয়েছেন। তৃতীয়তঃ হৃদয়ে সহস্রারে যার যেখানে ধ্যানের অভ্যাস সেখানে ঠাকুর অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ, জ্যোতির্ময় ইষ্টমূর্তিতে বিরাজ করছেন। চতুর্থঃ বিরাট ভগবৎসত্তা আবর্তিত করে চলেছেন এই মহাবিশ্ব।'

আমরা শ্রীঠাকুরের কথায় একটুক্ষণ চেষ্টা করতে নিয়ে হারিয়ে গেলাম আর শ্রীঠাকুর নিজে চোখ বন্ধ করে তীব্র বেগে জপ করতে করতে ও ওইভাবে ধ্যান করতে করতে কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীরভাবে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। (শ্রবণ-মঙ্গল—১ম-২৬)

বর্তমান সভ্যতার বিজলী বাতি বা ইলেকট্রিক লাইট তো সকলের ঘরেই জ্বলছে। কিন্তু এই ইলেকট্রিক আলোকে বিজ্ঞানী শ্রীঠাকুর বর্ণোজ্জ্বলির কাজে লাগিয়েছেন। শ্রীঠাকুর একটি stand করিয়েছেন। তাতে মানুষের উচ্চতা অনুসারে ওঠানো নামানো যায় এমন স্ক্রু দেওয়া একটি অ্যাডেল করিয়ে নিলেন। এই stand এর ওপর বসিয়ে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহী সকলকেই শ্রীঠাকুর বহুদিন ধ্যান করিয়েছেন, যাদের মন স্বভাবতই অন্তর্মুখী, চট করতেই নিমগ্ন হয়ে পড়ে, বিশেষ করে ধ্যান করতে বসে, তাদের ওই stand এ লাল বাল্ব

লাগিয়ে দিয়ে ধ্যান করাতেন। লাল হল রজোগুণের প্রকাশ। আমরা বহুদিন দেখেছি ওই লাল আলোর নীচে বসে ধ্যান করার জন্য উগ্র লাল আলোয় তমোগুণী স্বভাব লোক ও বেশী ভালো ভাবে সংযত হয়ে ধ্যান করতেন। আর যারা রজোগুণী খুব কর্ম চঞ্চল স্বভাবের মনই চট করে স্থির হতে চায় না। তাদের ধ্যানের সময় কখনও নীল আলো কখনও সবুজ আলো লাগিয়ে দেওয়া করাতেন। ওই স্নিগ্ধ আলোর তলায় বসে ভক্ত বা সাধুগণ নিমেষেই ধ্যানে ডুবে যেতেন, আমরাও করেছি ওই ভাবে। আর যারা সত্ত্বগুণ প্রধান ভক্ত বা সাধু তাদের ধ্যানের সময় শ্রীঠাকুর সাদা আলো লাগিয়ে দেওয়া করাতেন। ঘরখানি নিস্তব্ধ করে—ঠাণ্ডা করে অর্থাৎ অল্প করে পাখা চালিয়ে দিয়ে এইভাবে আলোর তলায় ধ্যান করে আমরা সকলেই যেন উন্নতি বোধ করেছি। আলোটি কারো আঙ্গা চক্রে কারো বা সহস্রারে adjust করে দেওয়া হত।

১৯৪৪-ডিসেম্বরের রাত্রি নিউঢ়ী আশ্রম ভক্ত ও সাধুরা ঘন হয়ে বসেছেন শ্রীঠাকুরের সামনে। সাধুদের শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখে যতটা পারা যায় সমভাব করার কথা অন্তত কানু হয়ে না পরা সম্বন্ধে কিছু বলার পর শ্রীশ্রীঠাকুর সন্তোষ বাবুকে (সন্তোষ চ্যাটার্জী) বললেন—

বল সন্তোষ, তোমার সায়েন্সের কথা কিছু বল, আমি দেখি, ধর্মরাজ্যে সেই অনুসারে কিছু বলা যায় কিনা।

এই যে সায়েন্সের মতবাদ এত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, এর মানে কি? এর পিছনে রয়েছে ওদের অক্লান্ত সাধনা। দিনরাত কত খাটছে বল তো? আর আমাদের শাস্ত্রীয় মন্ত্র নিয়ে অত খাটছে কে বল?

ধর্মরাজ্যে সায়েন্সের আবিষ্কার গুলোকে কাজে লাগাবার কথা আমার মনে আসে বর, সবাই তো আর হিমালয়ে যেতে পারে না, যদি air condition যন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার করে তাপ কমিয়ে, সেরকম আবহাওয়ার সৃষ্টি এই বাংলার বুকে করা যায়—আর ঘরখানি যদি sound proof হয় তোমাদের মন সেই ঠাণ্ডায় আর নিস্তব্ধ পরিবেশে আপনি ধ্যানে নিমিত্ত হয়ে আসবে।

আমার তো religions clinic-এর কথা মনে হয়—যেখানে ভক্তেরা ছুটে আসবে, মনে শান্তি পাবে, শরীর জুড়িয়ে যাবে, ধ্যান করে মনের জটগুলো খুলে যাবে। কিন্তু চাহিদা কই? (জনৈক সন্ন্যাসীর প্রতি) সেদিনের আমার wave trancemeet এর কথা মনে আছে তো?

শ্রীঠাকুরের কথায় সন্ন্যাসী বললেন, হ্যাঁ; ও অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ ঠিক সেই সময় সেইদিন যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হয়েছিল সেকথা শ্রীঠাকুরকে জানালেন—শ্রীঠাকুর বললেন,—এগুলোর অর্থ আছে। এসব পরীক্ষিত সত্য। পূর্ণাশ্রমের দাদা তোমরা তো জান দিল্লীতে থাকেন, বিজ্ঞানের ডক্টরেট D.S.C. আমি এখান থেকে আধ্যাত্মিক wave ছেড়েছি, ঠিক সেই সময়ে তাঁরও অনুভূতি হয়েছে। পরে চিঠিতে জানিয়েছেন সে কথা—সভীর অনুভূতি হয়েছে ইলেকট্রনিক বেগে যেন জপ হচ্ছিল, আর মাথার চারদিকে জ্যোতি সৃষ্টি হয়েছিল।

এসব practical জিনিষ। তোমার মনে আছে সে-বারের কথা? দেওয়াল, সামনের থামটা হাত দিয়ে দেখেছিলে, অনুভব করেছিলে সেটা জপের vibration-এ কাঁপছিল?

(কিছু ভাব তন্ময় থেকে) তা তারপরে কি বলছিলে?

সন্তোষ বাবু—গণিতের idea of limits, কোনো একটি function বিশেষ ক্ষেত্রে একটি limit এর দিকে পৌঁছাতে পারে তখনই, যখন তাদের ব্যবধান ক্রমে হতে হতে শেষ পর্যন্ত তা শূন্যে মিলিয়ে যায়।

শ্রীঠাকুর হ্যাঁ, ঠিকই। একটা বিশেষ চিন্তা এবং চিন্তনীয় সত্তা। এদের মধ্যে ব্যবধানও তেমনি কমানো যায়। কমতে কমতে এমন অবস্থা আসবে, তখন তা তদাকার কারিত হয়ে যাবে। খাওয়া, ধ্যান, যোগ বস্তু তখন বিভেদ হারিয়ে অখণ্ড সমরসে এক হয়ে যাবে।

সন্তোষবাবু—চিন্তাকে function of variable ধরে, তার ওপর limit-এর গণিত সংজ্ঞা আরোপ করার মধ্যে রয়েছে কত সোন্দর্য।

Infinity বা অনন্ত—গণিতে এর একটি সংজ্ঞা আছে।

infinity imagined যত বড়ই ধরি না কেন, তার থেকে আরও বড় যা।

শ্রীঠাকুর—বেশ বলেছ। ব্রহ্ম যে কি, তা মুখে বলা যায় না ; mathematical infinity-র মতই তা অনন্ত প্রসারী এবং অসীম হয়েও সঙ্কোচ।

(বিমলানন্দের প্রতি) mathematical infinity-র কথা তোমাদের বলেছি ?

বিমলানন্দ—হ্যাঁ ঠাকুর, শুধু বলেছিলেন তাই নয়, বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ও কাছে বসে করিয়েছিলেন mathematical ধ্যান।

শ্রীঠাকুর—(সত্যেন বাবুর প্রতি) এটা তোমাদের ভালো লাগবে। একটা idea কে pin-up করাই তো কথা।

মনের বিক্ষেপ আসতে পারে, কিন্তু যদি সেই ধ্যান-মূর্ত্তি circumscribed হয়। একটা geometrical project-এর সাহায্যে, আর বিন্দুর নিয়মিত সাধারণ পথ ধরে যদি মনের চক্র চলতে থাকে এবং গতিবেগের বিশুদ্ধতা যদি বজায় রাখতে হয়, তাহলে সেই পরিক্রমার মধ্যে মনের বিক্ষেপ টিকতে পারে কতক্ষণ। সে তিরিক্ষি হয়ে যাবে। এছাড়া আরও আছে tangent ধ্যান এরও একটা বিশেষত্ব আছে। স্পর্শক তো ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে ?

সত্যেনবাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকুর।

ঠাকুর—ইষ্টমন্ত্র পাখা যেন সেই স্পর্শক। তার গতি সৃষ্টি করে জগচ্চক্র। জগচ্চক্রে কেন্দ্রগত রয়েছেন tanscendental ঠাকুর বা ইষ্ট্। ঠিক Helix বা Spiral-এর মত আবর্ত্তিত হচ্ছে জগচ্চক্র, স্পর্শকের মত সর্ব্বদা ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

(শ্রবণ-মঙ্গলম্—১ম ৩০০)

শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব একদিন সত্যেন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে physical accelaration ও মনের accelaration সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে বললেন, জগৎ বা ধ্যানে time lengthened হতে পারে, shortened হতে পারে। ধ্যানে এক এক সময় মনে হয় দেখবে—'ঠাকুর যেমন ধক্কিদেরকে লীলায় এক জায়গায় বলেছেন—তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে, তোমরা অনাদিকাল বসে আছ।' আমার নিজেরও গভীর ধ্যানে মন ডুবে গেলে কোন্ দিক দিয়ে সময় পেরিয়ে যায়—মনে হয় যেন অল্প সময়—কোন্ দিয়ে সময় পেরিয়ে যায় যায় বা ক'টা বাজলো খেয়াল থাকে না। তবে যেদিন মন বসেনা—সেদিন আলাদা কথা।

শ্রীদিন আরও বলেছিলেন—Theory of relativity-তে বলা পড়েছে আলোর গতিবেগ খুব বেশী। সূর্য্যের আলো পৃথিবী পৃষ্ঠে আসতে বোধহয় ৪।৫ মিনিটের মত লাগে। আর আমরা স্মরণ মাত্রই সূর্য্যে যেতে পারি। মনের গতিবেগ খুব বেশী। তবে সাধারণ মনের গতি-বেগের একটা minimum stage আছে। Absolute মনের গতিবেগ চিন্তার বাইরে। সাধারণতঃ আমাদের মনটা অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িত—বাসনাযুক্ত মনের গতিবেগ অচিন্ত্য—(শ্রবণ-মঙ্গলম্—৩য় খণ্ড, ৬১)

আইনষ্টাইনের Theory-তে curveture of spahe ঘোষিত হয়েছে। আমাদের মনেও সেইরকম curveture আছে—বিষয় বাসনার চাপে curveture—তাই ধ্যানে বসে মন চট করে স্থির হয় না—মনটা অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও এদিক-সেদিক ঘুরপাক খায়।

(শ্রবণ-মঙ্গলম্—৩য় খণ্ড, ৬২)

বুদ্ধপূর্ণিমার দিন—ভগবান বুদ্ধদেবের জীবনী পাঠ হচ্ছিল। শ্রীঠাকুর নিজেই প্রশ্ন তুললেন, 'আচ্ছা বল দেখি, তাঁদের শূন্যবাদ কেন টিকলো না ?' ভক্তেরা ঠিক মনের মত উত্তর দিতে না পারায় শ্রীঠাকুর নিজেই প্রশ্নটির উত্তর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দিলেন।

'যতক্ষণ এই জগতের মধ্যে আছে—মানুষ ততক্ষণ শূন্য চিন্তা করে থাকতে পারে না। মনকে বাসনা শূন্য করলে, কিন্তু সেখানে ব্রহ্মবস্তু বা এক বিরাট সত্তার উপলব্ধি বা আনন্দ যদি না থাকে, বা ভগবৎ চিন্তা যদি না থাকে তাহলে মন কতক্ষণ শূন্য থাকবে ? বুদ্ধদেবও অতিকয়েক বিশেষ শিষ্যদের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু সকলের পক্ষে তো এই শূন্যবাদ কঠিন—শূন্য মনে থাকা যায় না, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা কেউ হয়তো বারো বছর, সাধ্য

দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে শূন্য ধ্যান করে কাটিয়ে দিলেন —কিন্তু সকলের তো এই কার্য নয়। বিজ্ঞানের একটা theory আছে,—nature abhors vacuum. প্রকৃতিই শূন্য স্থান থাকতে দেয় না—মানুষের মনের ক্ষেত্রেও তাই। মনকে সবকিছু থেকে সরিয়ে নিয়ে এনে যদি ব্রহ্মচিন্তা বা ইষ্টচিন্তা, ইষ্টনাম স্মরণ—এসবে নিয়োজিত না করা, তাহলে সাধারণ মনে সে ক্ষেত্রে বাসনার স্রোত বইতে থাকে। এইজন্যই তো পরবর্তীকালের বৌদ্ধরা কাপালিক হয়ে গেল। কতকটা সমাজের ধর্মবিরোধী হওয়াতেও তাদের বৌদ্ধধর্ম টিকলো না। অবশ্য আরও কারণ থাকতে পারে।

একদিন শ্রীঠাকুর তাঁর প্রিয় শিষ্য বা সন্তান শ্রীসন্তোষ যোষাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক আলোচনা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের vector, scalar, resultant, geodesic ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন এ সম্বন্ধে বর্ণপ্রসঙ্গও আলোচিত হচ্ছিল। সবশেষে শ্রীঠাকুর বললেন—

আমাদের মনে যতক্ষণ তুমার দিকে দৃষ্টি না পড়ছে, আমরা সীমার মধ্যে থাকি—ততক্ষণ এটা সেটা নিয়ে থাকি, যেমন ছেলেবেলায় একরকম চলে—এদিক ওদিক করি, কিন্তু যদি eternal এ ফেলে দিই—অনন্ত দেশ-কাল সম্বন্ধে ফেলে দিই—তাহলে একদিন না একদিন ব্রহ্মাবগাহী হব, তদ্ভাবে লাভ করব। এর একটা scientific দিক আছে—যেমন ছেলেবেলায় পড়াশুনা এদিক ওদিক করতে করতে ক্রমে বড় হলে একটা দিক ঠিক ঠিক ধরে যায়—তেমনি তার vector (vector হচ্ছে সেই সত্তা যা entity যার magnitude বা পরিমাণ এবং একটা direction বা দিক আছে) এদিক ওদিক করে একটা কোন নির্দিষ্ট দিক নেয়—কিন্তু যখন বিরাট দেশকালে, অনন্ত গতিভঙ্গীতে ফেলে দিই, তখন তার একটা বিভাগতিভঙ্গী, invariable গতিভঙ্গী পাওয়া যায়। তেমনি আমাদের মনের গতিকে যদি অনন্ত দেশ-কালের মধ্যে ফেলে দিই—তাহলে আমরা যেমন আমাদের মন ব্রহ্মাবগাহী হয়েছে—মনের আর অন্য গতি নাই।

ব্রহ্মাবগাহী মনের vector সরল পথ ধরে চলে—অন্য গতি রুদ্ধ হয়ে যায়—

দুটি কাছাকাছি ছোট চুম্বকের মাঝখানের ক্ষেত্রের lines of forces খুব curved হয়ে যায়। কিন্তু পৃথিবীর interior-এ যে বিরাট চুম্বক আছে তার lines of forces parallel যেখায়। Curvature প্রায় নাই বললেও চলে। তেমনি আমরা যখন ক্ষুদ্রগতি, ভোগ বাসনার গণ্ডির মধ্যে আছি, তখন আমাদের মনের vector খুব দিক পরিবর্তনশীল, জটিল হয়, কিন্তু যখন আমাদের মন ব্রহ্মাবগাহী হয়ে যায়, তদ্ভাবমুখী হয়ে যায়, মনের গতির সমান্তরাল রেখায় চলে, parallel line-এ চলে—এদিক ওদিক গতি তখন রুদ্ধ হয়ে যায়।

এরপর শ্রীঠাকুর বিজ্ঞানের dynamic ও static শব্দটী নিয়ে বর্ণপ্রসঙ্গ আলোচনা করলেন ও বললেন—

এক একটা মানুষের এক একটা সত্তা আছে। যাদের dynamic সত্তা তাদের ইষ্টকে নিয়ে dynamic ভাবে জপ ধ্যান করতে হবে—তা ভিন্ন তাদের মনটা এলোমেলো হয়ে যাবে ; জপ ধ্যানের সময় অফিস কোর্ট ঘর সংসার চলে আসবে। আবার যাদের static সত্তা তারা তদ্ভাবে বিষয় ইষ্ট বিষয় ধ্যান জপও static ভাবে করবে। তারা আবার যদি dynamic ভাবে ধ্যান করতে যায়; তাহলেও আবার মন চঞ্চল হয়ে যাবে। অবশ্য যদি একেবারে static আবার একেবারে dynamic কেউ বড় একটা হয় না—কিছু মিশ্রণ থেকে যায়—তবু যেটা প্রধান সেই অনুপাতে জপ ধ্যান করা উচিৎ। যেমন কেউ হয়তো খুব dynamic ভাবে চট করে ইষ্ট বিষয়ক সেবা পূজার কাজ করতে পারে, সে ওই ইষ্ট চিন্তার সময়েও খুব dynamic ভাবে ধ্যান করবে—যেমন মালা পরালে চট চট করে ঘনটা বদ রকমের মালাই পরালে—যারা ওই dynamic nature এর তারা যদি আস্তে আস্তে মালা পরায় তখন এলোমেলো চিন্তা এসে যাবে। কাজেই তাদের ধ্যানেও ওই dynamic force সৃষ্টি করবে। আবার যাদের জেবেচিন্তে কাজ করা অভ্যাস—ধীর স্থির স্বভাব, তারা ধ্যান জপও static ভাবে ধীরস্থিরভাবে

করবার চেষ্টা করবে। যেমন অমর হয়ে তুমি যেন ইষ্ট চরণপদ্মে বসে মধুপান করছ বা চরণ দুটি আঁকড়ে ধরে আছ ইত্যাদি ইত্যাদি। (শ্রবণ-মঙ্গলম্—৩য়, ১০১)

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠের আসরে পাঠ হল —নির্জ্জন না হলে ভগবানের চিন্তা হয় না ; সোনা গলিয়ে গয়না গড়াবো, তা যদি গলাবার সময় পাঁচবার ডাকে তাহলে সোনা গলান কেমন করে হয় ?

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণীর আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব অনেক সুন্দর কথা বললেন—যেমন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়েও ব্যাখ্যা করলেন—

বিখ্যাত পদার্থ তত্ত্ববিদ Louis Broglie প্রমুখ অপরাপর পদার্থ তত্ত্ববিদগণ বলেন—আমরা এক তরঙ্গায়িত বিশ্বে বাস করছি। 'We are living in a universe of waves and the waves are nothing but vibrations of variova lengths. Sir Arthur Eddington প্রমুখেরও ওই এক মত।

আমাদের শরীর ও মনের আবেগ বা অনুভূতিকেই ধরা যেতে পারে এক একটী vibration বা কম্পন। Acoustics বা শব্দ বিজ্ঞানে বলে যে স্পন্দিত বস্তু যে কম্পন বা বেগ সৃষ্টি করে, তাকে স্থায়ী করতে হলে চাই এমন একটী বস্তুর সাহায্য যাতে হতে পারে resonance বা অনুরণন। তেমনি আমাদের দৈহিক বা মানসিক আবেগ, অনুভূতি, বাসনা, কামনা যদিঃ প্রকাশের জন্য যদি কোনো resonant body বা অনুরণনের সহায়ক বস্তু না পায়, তাহলে হয় তা সঙ্গে সঙ্গে থেমে যাবে, অথবা যত্ন প্রকাশের পর তা তিমিত হতে হতে লীন হয়ে যাবে।

আমাদের দেহ মনের কামনা, বাসনা, ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি ইত্যাদির vibration গুলি আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব ভোগ্যবস্তু ইত্যাদির মধ্যে থাকলে resonant body পাবে, আর অনুরণিত হতেই থাকবে—কিন্তু যদি আমরা নির্জ্জনে সরে যাই, ভোগ্য বস্তু থেকে সরে যাই, তাহলে সেই vibration গুলি resonant body-র অভাবে অপনিই তিমিত হয়ে আসবে।

সাধক যদি সেই 'vibrationless vibration' অথবা 'Uniform vibration অথবা ব্রহ্মবস্তু বা তৎসৎ বস্তুকে লাভ করতে চায়, তাহলে তো তাকে ইন্দ্রিয়জ vibration তিমিত করার সাধনা করতে হবে। তাই গীতামুখেও শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলেছেন—

ধ্যানং চাসনং যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্ত দেশসেবিত্বমরতির্জ্জন সংসদি।

এইজন্য মাঝে মাঝে নির্জ্জনে অবস্থান ও সাধনা মুক্তি-পথে একান্ত প্রয়োজন। (শ্রবণ মঙ্গলম ভূয় ২১৭)

(ক্রমশঃ)

—:o:—

ভগবান আদি শঙ্করাচার্য্যের দৃষ্টিতে কর্ম

শ্রীআর, বেঙ্কটরমন্

[অনুবাদ—পুষ্পিত মুখোপাধ্যায়]

মনুষ্য কিম্বা কোনও প্রাণী কর্মবর্জিত থাকতে পারে না। প্রতিটি ক্ষণেই মানুষ কোন না কোন কর্ম করছেই। অতএব কর্ম সর্বথা পরিত্যাজ্য হতে পারে না। এতে প্রশ্ন ওঠে যে, তাহলে আদি শঙ্করাচার্য্যের মত মহাজ্ঞানী কর্মমার্গে শুধু সঙ্কটের কথাই বলেন কেন ? যেমন—

"ঈর্ষ্যে নরতি বিজ্ঞানমন্যঃ প্রাপয়তি ক্রিয়া।
কথমন্যোন্যসাপেক্ষা কথং তাভ্যাং সমুচ্চয়ঃ।

(সর্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত সারসংগ্রহ, শ্লোক—১৮৩)

এই শ্লোকে আচার্যপ্রবর স্পষ্ট বলেছেন যে, জ্ঞান এবং কর্ম এই দুই মার্গ একে অপরের থেকে সর্বথা বিপরীত। ব্রহ্মজ্ঞানই বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান। এইজ্ঞান মানুষকে ওপরে উঠিয়ে ব্রহ্ম পর্যন্ত পৌঁছে দেয় কিন্তু কর্ম তাকে নীচে নামিয়ে আনে। কর্ম তো মানুষকে মর্ত্যলোকের বন্ধনে বেঁধে ফেলে। তাহলে এই দুয়ের মাঝে সামঞ্জস্য কিভাবে হতে পারে? দুয়ের সম্মিলন কি কোথাও সম্ভব? বিপরীতমুখী দুটি পথের কি মিলন সম্ভব?

"যোগারূঢ়স্য সিদ্ধস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
নাস্ত্যন্যেন হি যদ্বিদ্বঃ কা কথাঽত্র কর্মণাম্।" (সর্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত সার সংগ্রহ—৮৬৪)

বাহ্যজগতের বিষয়ে যে জড়িয়ে আছে সেইই কর্মে তন্ময় থাকবে, না কি যোগী, যোগারূঢ় সিদ্ধ পুরুষের কোন কাজ বাকী থাকে না। তাঁর দৃষ্টিতে বাহ্যজগৎ বা বস্তু বলে কিছু নেই (কর্মে জড়িয়ে থাকা ব্যক্তি বুদ্ধিমান কদাপি নয়।) তাঁর অন্তর্মুখ দৃষ্টি আত্ম বিশ্লেষণে সবকিছুই ঈশ্বরই ঈশ্বর। সেখানে অন্যকর্মের প্রশ্নই বা কোথা থেকে আসবে?

আচার্যশঙ্কর এধরণের ব্যক্তিদের পরিচয় প্রদান করতে চাইতে বিশেষণ দান করেছেন—যোগারূঢ়, সিদ্ধপুরুষ, কৃতকৃত্য এবং যোগী। যেখানে তাঁদের চিন্তা ভাবনা পর্যন্ত বাহ্যিক জিনিষ বস্তুর ওপর প্রযোজ্য নয় সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি কর্মের রাস্তায় চলবেন, এতে বলার কি অপেক্ষা রাখে? সেইই তো কৃতকৃত্য—যে সবকিছু করে নিজের কর্তব্য পূর্ণ করেছে। তার আর এখন কারো কাছে কোন রকম ঋণ থাকে না।

অন্য এক প্রসঙ্গে ভগবান শঙ্কর বলেছেন যে, ক্রিয়া সমূহের নাশ হওয়াই মুক্তি মার্গের প্রথম পদক্ষেপ, তারপর ক্রমশঃ মানুষ মুক্তি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাঁর মতে কর্মত্যাগ থেকে চিন্তামুক্তি, তা থেকে বাসনাক্ষয় এবং জীবন্মুক্তির পথে মোক্ষলাভ—

"ক্রিয়ানাশো ভবেচ্চিন্তানাশোঽস্যাবাসনাক্ষয়ঃ।
বাসনাপ্রক্ষয়ো মোক্ষঃ সা জীবন্মুক্তিরিষ্যতে।"

ওপরে মোক্ষসিদ্ধির তিনটে সিঁড়ির কথা বলা হয়েছে। মোক্ষের মত পরম উৎকৃষ্ট লক্ষ্য বস্তুকে পাওয়ার জন্য ক্রমশঃ এই তিনটে বিষয়কে পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

আচার্যশঙ্কর চান যে সর্বপ্রথম ক্রিয়া নাশ হবে তা দ্বারা চিন্তা বা ব্যর্থ চিন্তা ঘুচে যাবে। তারপর বাসনা সমূহ ক্ষয় যায়। বাসনা দূর হয়ে যাওয়াটাই মোক্ষ। এটাকে জীবন্মুক্তিও বলা হয়। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, যদিও ওপর থেকে ক্রিয়ার তারপর চিন্তার তারপর বাসনা সমূহের নাশের কথা এই শ্লোকে উল্লেখিত, তথাপি প্রত্যেকটি বাসনাই মানুষকে ওপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এটা মোক্ষের ক্রমিক সিঁড়ি।

যদি মানুষ সবসময় কিছু না কিছু করতেই থাকে তাহলে তার তাৎপর্য্য এই যে, তার মন কোন কিছুর পেছনে ব্যস্ত। আকাঙ্খা বৃদ্ধি কার্য্যেরও বৃদ্ধি ঘটায়। একটা কার্য্য সফল হতেই নূতন অভিলাষা সমূহ জন্ম নেয় তারপর পুনরায় নূতন নূতন কার্য্য। মানুষ ওই সবের মধ্যেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে—

"বাসনাবৃদ্ধিতঃ কার্য্যং কার্য্যবৃদ্ধ্যা চ বাসনা।
বর্দ্ধতে সর্বথা পুংসঃ সংসারো ন নিবর্ত্ততে।" (বিবেক চূড়ামণি—৩১৪)

"বাসনাবৃদ্ধিতেই কার্য্যও বৃদ্ধি পায়। এদিকে কার্য্যবৃদ্ধি দ্বারা নূতন নূতন বাসনা প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। এই ধরণের চক্রে জড়িত ব্যক্তি কখনো সাংসারিক কামনা থেকে মুক্ত হতে পারে না, রেহাই লাভ করে না।"

কর্মের জালে জড়িয়ে পড়া ছাড়া কোন ব্যক্তি কি বাঁচতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর ভগবান শঙ্করাচার্য নিজের প্রবোধ সুধাকর নামক গ্রন্থে দিয়েছেন। কর্ম থেকে রেহাই প্রাপ্ত ব্যক্তি তো ঘর দুয়োর ছেড়ে অরণ্যে

চলে গিয়ে থাকবে এই ধরণের চিন্তা ভাবনা আমাদের মধ্যে অনেকের মনে হবে, কিন্তু আচার্যের বক্তব্য মত কোথাও পালাবার প্রয়োজন নেই—

"মমতাভিমানশূন্যো বিষয়েষু পরাঙ্মুখঃ পুরুষঃ।
তিষ্ঠন্নপি নিজসদনে ন বাধ্যতে কর্মভিঃ কাপি॥" (প্রবোধ সুধাকর, শ্লোক ৮০)

নিজের ঘরের সাধারণ দৈনিক কার্যসমূহে একান্ত হয়েও মানুষ কর্মদ্বারা বাধিত নয়। এটাই আচার্যশঙ্করের উপদেশ। যার মনে সামান্যতম মমতা, অহংকার না থাকে এবং যে বিষয়ী নয় এরকম ব্যক্তি নিজের ঘরে থেকেও ও মুক্ত পুরুষ।

জ্ঞানীর কোন কর্তব্য অর্থ সমাপ্ত থাকে না। সে সবকিছু শেষ করে ফ্যালে। এই কারণেই তাকে কৃতকৃত্য বলা হয়েছে।

কর্মপূর্ণ করা ছো' জ্ঞানবান পুরুষের জীবনে পুরোনো বিষয়, বিষয়গুলির কথা। নদী পার হয়ে ওপারে পৌঁছে যাওয়া ব্যক্তি পুনরায় ফিরে কেন নিজের পুরোনো কিনারায় ফিরে আসতে চাইবে?

"পারপন্ন যথা নদ্যাস্তদ্বত্ত: পারং বিমার্গতি।
আপ্তজ্ঞেস্তেত্ তথা কার্যাং কর্তুমন্যাদিচ্ছতি।
(উপদেশ সাহস্রী, তৃতীয়াদি প্রকরণ শ্লোক—১৩)

আপ্তবেত্তা তাহলে কেন কর্মের রাস্তায় চলবে? এখানে ভগবান শঙ্কর একটি উদাহরণ দেন, কেউ নদী পেরিয়ে ওপারে পৌঁছবার পর আবার এই কিনারায় ফিরে আসার চিন্তা কেন করবে? সব কর্ম শেষ করে জ্ঞানবান হয়ে আবার কোথাও ফিরে জ্ঞানমার্গ ছেড়ে কর্ম বন্ধনে কেন জড়াতে চাইবে?

প্রথমেই একথা স্পষ্ট বলে নেওয়া হয়েছে যে বিজ্ঞানই হচ্ছে মুক্তিমার্গ এবং কর্ম বন্ধনের। কর্মকে বস্তুত: কর্মের আসক্তিকে ছেড়ে আত্মানুভবের আবশ্যকতা হওয়া উচিত।

কর্ম, ক্রিয়া, কার্য্য এই তিনটি সংস্কৃত শব্দ এই শ্লোকে সমান অর্থে প্রযুক্ত, সব জায়গায় আচার্যশঙ্কর কর্মকে সমান নিষিদ্ধ গণ্য করেন।

একস্থানে শঙ্করাচার্য্য কর্মের একটি তালিকাও তৈরী করেছেন। আমরা সাধারণত: সৎকার্য্য মনে করে থাকি, সেগুলোকেও আচার্যপ্রবর নিজের শ্লোকে ব্যর্থ বলেছেন—

"শ্রুতয় শাস্ত্রাণি মতস্ত দেবান / কৃৎস্ন কর্মাণি তথস্ত দেবতা:।
আত্মৈকাবোধেন বিনা বিমুক্তিন / দিগ্যাতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি। (বিবেকচূড়ামণি / ৬)

শাস্ত্রসমূহের প্রবচন, দেবতাসকলকে প্রসন্ন করার জন্য যাগযজ্ঞ-ঈশ্বরারাধনা-এ সমস্ত প্রায়শ: সদাচারীর কার্য্য মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে ভগবান শঙ্করাচার্য্য এ সকল কর্মকে বৃথা মনে করেন। বস্তুত: এ সকল ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যর্থ যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্ম এবং আত্মার একতা সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান না হয়। ঈশ্বরীয় জ্ঞানবিনা এমনি পুষ্পাঞ্জলী দেওয়া বা যাগযজ্ঞ করা ইত্যাদি সমস্ত কাজ বৃথায় পর্যবসিত হয়। হাজার ব্রহ্ম এসে চলে যাবেন কিন্তু আমাদের ব্যক্তিত্ব যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাবে। ভগবানের নিকট সে মুক্তিমার্গে এক পাও এগোতে পারবেন না। জ্ঞান যজ্ঞের সামনে কর্মযোগ টিকতে পারে না। জ্ঞানীর কোন কর্তব্য নেই, এটাই আচার্যশঙ্করের দৃষ্টি। আর দৃষ্টি সৎকর্ম, নিষ্কামকর্মসমূহ জ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন। গীতা—৩।১৭ তেও প্রায় এই কথাই জ্ঞানীর জন্য বলা হয়েছে।

—:০:—

পৃথিবীতে একদিন

নচিকেতা ভরদ্বাজ

পৃথিবীতে একদিন সবকিছু শেষ হ'য়ে আসে।
এমন কি আকাশে নক্ষত্রেরা মরে,
নদীরা শুকিয়ে যায়, ঝোরেরা হারায়
শরীরী লাবণ্য তার প্রতি অমাবস্যা এসে
আঁধারের কাছে।
আমাদের অন্তঃপুরে আমাদের সুখদুঃখ প্রহরে প্রহরে
কেমন পালটায়। নানা রূপান্তরে জীবন যাত্রার
পরিবর্তনের খেলা; কেউ কিছু থাকে না এখানে।
এমন কি সমুদ্র সেও অগভীর হতে থাকে, সূর্যের কিরণ
উত্তাপ হারিয়ে ফেলতে ধীরে ধীরে
গ্রহাণের সহজ বিজ্ঞানে।
তবে শুধু ঘর নয়, দুঃখ তার শোক ভুলে
যা কিছু অপ্রিয়,
অন্ধকার—সকলেরই অন্তর্হিত পরিশেষ আছে।
স্মৃতিও বিস্মৃতি হয়। পালটায় মানুষের মন
এমনতো স্থিতধি হয়ে—বিবিক্তিতে কিছুটা দুঃখ প্রহণ করিত
অন্তরাল মেনে নিত। সহজাত সুখের প্রয়াসে
সংযত সন্ধ্যারেখা হওয়া ভালো। অন্তর্ধান অক্ষিত যৌবন
তোমাকে কেবলমাত্র প্রত্যাশিত করে যেতে পারে।
পরিণাম জেনে নিলে প্রত্যাশাও শুধু স্পষ্ট হবে;
বন্ধ্যাত্বী হলেই তুমি সুনিশ্চিত কোন যন্ত্রণার
দায়ভাগী হবে। এই জীবনের অনন্ত আঁধারে
কিছুই থাকে না যদি—তাহলে সৌরভে
যা পেয়েছ—তাই নাও: পরিক্লান্ত চেতনার তলে
কোনোদিন হয়তো বা যুক্তিরও জন্ম হতে পারে।
পালক-ঝরন দিন, প্রত্যাশার উত্তুঙ্গ শিখর
ভেঙে পড়ে একে একে। সম্রান্ত সন্ধ্যের আঁচলে
তাহলে আবৃত করো আন্দোলিত আকাঙ্ক্ষার ঝড়।

—:০:—

তবু ভালো লাগে

ডাঃ গোবিন্দ চক্রবর্তী

ডাক্তার, ভালো আছি।
তাই আর আসিনি জানাতে
অবহাওয়া ভালো থাকাটুকু।

জান তো, আমাদের ভালো থাকা
আমাদের জীবন,
ছোট সুখ, বড় দুখ, কিছু ভালবাসা
আর কিছু আশা
ঐ নিয়ে গড়া।

তারই মাঝে হয় কথাকথি
টানাটানি, হানাহানি চলে
কেউ জেতে, কেউ হারে,
তবু টিঁকে থাকে—
সুখী সুখী মন
আমাদের জীবন।

ক্লান্তমনে অবসাদ আসে,
মন চায় ছেড়ার জন।
মনে হয় এ জীবন নিয়ে
এর চেয়ে ভাল মরে যাওয়া;
কিংবা ছেড়ে চলে যাওয়া,
কাজ ফুরোবার আগে।

কখনও জীবনটাকে দামী মনে হয়,
মনে হয়, প্রাণ ভ'রে পিপাসা মিটাই।

কেউ বলে, খামকুমি খাও;
কারো মতে সব সুখী ভান,
বিলাসকরণী নাকি খেলে
দেখা যায় জীবনের আলো।

তবু ভালো লাগে
বাঁচা বাঁচা খেলা।

তবু তাকে পেতে চাই

শান্তশীল দাস

সব আলো নিভে গেলে
একটি প্রদীপ তবু জ্বলে ;
সেই প্রদীপের আলো
নেভে না, নেভে না কোনদিন।
সে জ্বলে, আপন মনে জ্বলে—
কে দেখে, কে দেখে না কো,
শিখা তার চির অনির্বাণ।

কত দিকে কত ঝড়,
নিত্য কত অঘটন ঘটে ;
কত ভাঙা, কত গড়া
কত কোলাহল চারিধারে।
সেই দীপশিখা একই মতো
অচঞ্চল দীপ্তি নিয়ে
জেগে থাকে, অন্তর যেন সে।

আমি সেই শিখা খুঁজি,
কখনো-কখনো দেখা পাই,
ঢকিতে সে দেখা দিয়ে
তীরে কোথা যায় সে হারিয়ে।
আর তাকে পাইনে কো খুঁজে ;
কত আলো জ্বলে, তবু
ওরে নাকো এ মন আমার।

সেই আলো চাই আমি,
অনির্বাণ সেই দীপ্তিটুকু ;
অচঞ্চল শিখা নিয়ে
থাকুক সে আমার সম্মুখে।
চাইনেকো আর কিছু আমি—
তার পায়ে ঢেলে ঢেলে
কেটে যাক জীবন আমার।

অলক্ষে সে আছে জানি,
তবু তাকে পেতে চাই সম্মুখে আমার ;
অনুক্ষণ মনে হয়,
সে আমার চিরসাথী, ভয় নাই তাকে হারাবার।

কথামৃত-কথায় সত্যানন্দ সঙ্গীত

স্বামী বোধানন্দ

[১]

যুগতীর্থ দক্ষিণেশ্বর। মন্দিরে বিরাজিতা জাগ্রতা জননী ভবতারিণী। তাঁকে দর্শন করছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মায়ের পাদপদ্ম হ'তে নির্মাল্য নিয়ে মস্তকে ধারণ করলেন। মাকে প্রণাম আর প্রদক্ষিণ করলেন, চামর হাতে নিয়ে মাকে ব্যজন করলেন। ঠাকুর ভাবে মাতোয়ারা। মন্দিরের বাইরে আসবার সময় দেখলেন ভক্ত ঈশান মুখুজ্যেকে। কথা প্রসঙ্গে বল্লেন তাঁকে—"আর, তুমি সালিসী মোড়লী ওসব কি কর্‌ছো? লোকের ঝগড়া বিবাদ মিটাও—তোমাকে সালিসী ধরে,

শুনতে পাই ওতো অনেকদিন ক'রে আসছো যারা করবে তারা করুক। তুমি এখন তাঁর পাদপদ্মে বেশী ক'রে মন দাও। বলে, 'লঙ্কায় রাবণ ম'লো, বেহুলা কেঁদে আকুল হ'লো।' কেশব সেন বলেছিল— ঈশ্বর দর্শন কেন হয়না? তা বল্লুম যে, লোকমান্য, এসব নিয়ে তুমি আছ কিনা, তাই হয় না। ছেলে চুসী নিয়ে যতক্ষণ চোসে, মা ততক্ষণ আসে না। লাল চুসী খানিকক্ষণ পরে চুসী ফেলে যখন চীৎকার করে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে আসে।···তুমিও মোড়লী কোচ্চ। মা ভাবছে, ছেলে আমার মোড়ল হয়ে বেশ আছে। আছে তো থাক্।"···ভক্ত ঈশান ইতিমধ্যে ঠাকুরের চরণ স্পর্শ ক'রে বসে আছেন। চরণ ধরে বিনীত ভাবে বলছেন—"আমি ইচ্ছা ক'রে এসব করি তা নয়।" ঠাকুর উত্তর দিলেন—"তা জানি। সে মায়েরি খেলা। এঁরি লীলা। সংসারে বদ্ধ ক'রে রাখা সে মহামায়ার ইচ্ছা। কি জান? 'ভবসাগরে উঠছে ডুবছে কত তরী।' আবার ঘুড়ি লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপ্‌ড়ি। লক্ষের মধ্যে দুই একজন মুক্ত হয়ে যায় বাকী সবাই মা'র ইচ্ছায় বদ্ধ আছে ···চোর চোর খেলা দেখ নাই? বুড়ীর ইচ্ছা যে, খেলা চলে। সবাই যদি বুড়ীকে ছুঁয়ে ফেলে, তাহ'লে খেলা আর চলে না। তাই, বুড়ীর ইচ্ছা নয় যে সকলে ছোঁয়।···আর দেখ বড় বড় দোকানে চালের বড় বড় ঠেক থাকে। ঘরে চাল পর্য্যন্ত উঁচু চাল থাকে দালও থাকে। কিন্তু ইঁদুরে খায়। তাই দোকানদার কুলোয় ক'রে ক'রে খই মুড়কী রেখে দেয়। ঐ খই মুড়কী মিষ্টি লাগে আর সোঁধা গন্ধ—তাই ইঁদুরগুলো সমস্ত রাত কড়র মড় করে খায়, চালের সন্ধান আর পায় না। —জীব কামিনী কাঞ্চনে মুগ্ধ হয়। ঈশ্বরের খবর পায়না। ···মা। এও তোরই মজার খেলা।"—

জানি জানি গো মা
এও তোরি মজার খেলা
ভবসাগর মাঝে গো মা
ওঠে ভোবে কতই ভেলা।
লক্ষ মাঝে দুই এক মুক্ত
বাকী সবাই আছে বদ্ধ
বুড়ী ছোঁওয়া ইচ্ছা না তোর
নইলে ফুরায় খেলার পালা।
চালের বড় ঠেক্ যে থাকে
মুড়কী খই সেথায় রাখে
গন্ধে তারি ছুটে যাওয়া
জীবের ওমা ভোগের বেলা।
চুসী নিয়েই থাকে ছেলে
মায়ের আসা নয় সে কালে
ছুটে আসে কাতর কাঁদায়
হয় যদি গো চুসী ফেলা।—সত্যানন্দ

—:০:—

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসঙ্গী মহেন্দ্র মাষ্টার "মঙ্গল মালিকা"

শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব হুগলি জেলার কামারপুকুর পল্লীর প্রশান্ত পরিবেশে ১৮৩৬ সনে, আর তাঁর লীলা-সহচরদের কয়েকজনের জন্ম হয়েছিল কোলাহলময় কোলকাতার বুকে, তাদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ দত্ত আর মহেন্দ্র গুপ্ত জন্মেছিলেন সিমুলিয়া পল্লীতে। বিদ্যাসের দাবদাহের পরে স্নিগ্ধ বারিধারা বর্ষণেরকালে আষাঢ় মাসের শেষদিনে ১৮৫৪ সনের নাগপঞ্চমী তিথিতে, নবযুগের মহেন্দ্র জন্মে জন্ম হল দেবশিশু মহেন্দ্রনাথ গুপ্তর। পুরনারিগণ শঙ্খধ্বনি আর উলুধ্বনি দিয়ে নবজাতককে বরণ করলেন :—

। গান : ১ ।

কে ঐ আনিলরে সিমুলিয়া পল্লীতে
পুলকে নাচিয়া উঠিল প্রাণ।
সুখরবি হাসিল দশদিশি ভাসিল
গগনে উঠিল নব গান।
কথামৃত যাঁর অমর কাহিনী, মাষ্টার মশায় এই
নামে আসি
রামকৃষ্ণ গত মন, সারদাবিলীন প্রাণ তাঁহারে
জানাই প্রণাম।

সিমুলিয়া পল্লী থেকে পিতৃদেব মধুসূদনের নতুন বাসভবন, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে, মহেন্দ্রনাথ শশীকলার মতো দিনে দিনে বাড়তে থাকে পিতৃস্নেহ আর জননী ধর্মময়ীর কল্যাণময় অঙ্কে। কৈশোরে মহেন্দ্রনাথ স্কুলে কলেজে উত্তম ছাত্র ছিলেন। হেয়ার স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ ক'রে প্রেসিডেন্সী কলেজের কৃতিছাত্র ১৮৭৪ সনে সসম্মানে বি.এ পাশ করেন। তখনকার কালে ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদলের অধিকাংশে ব্রাহ্মভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল। মহেন্দ্রনাথেরও সেই অবস্থা। আর একটি মূল্যবান গুণের অধিকারী ছাত্রেরা শিক্ষকের। স্কুলে কোর্থ ক্লাসে পড়ার কাল থেকেই। সেই অভ্যাস বশতঃই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ দিবস আর দর্শনের বিবরণ সংরক্ষণ করেছিলেন। তাই থেকে পরবর্তীকালে বিশ্বের ধর্ম ও আধ্যাত্মিক নব সম্পদ।

কলেজে পড়ারকালেই ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের সম্পর্কীয়া ভগ্নী নিকুঞ্জদেবীকে বিয়ে করেন। পরে পারিবারিক জীবন গুপ্ত মশায়কে গুপ্তভাবে বহন করছিল। সেই প্রবাহ থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশায় তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে পড়েন। ঐ নিরুদ্দেশ মানুষটিই দিশারী সন্ধানে এলেন বরাহনগরে। আর ১৮৮২ সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারী দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরে উপস্থিত হলেন, মহেন্দ্রনাথের অন্তরের কালা জুড়াতে—

। গান : ২ ।

জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আসি
কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই
কে খেলায় আমি খেলিবা কেন,
আসিয়া ঘুমাই কুহকে যেন
এ কেমন ঘোর হবে নাক ভোর
অধির যেমতি সমীর
অবিরামগতি নিয়ত ধাই
কর হে চেতন যে আছ চেতন, কতদিনে
বলো ভাঙিবে স্বপন
করো, তমোনাশ হও হে প্রকাশ
তব পদে তাই শরণ চাই।

ঐ সময় দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরস্থ মনোরম দেবালয়ে পবিত্র পরিবেশের অবস্থান প্রকোষ্ঠে ঠাকুর যেন শুকদেবের ভাব

ভাবস্থ প্রসন্ন করলেন, মহেন্দ্রনাথ সসম্ভ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে প্রবেশ করলেন। অচিরেই মাষ্টারের পরিচয়াদি সেবার কালে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ হলেন—

। গান : ৩ ।

ভেবে দেখ মন, কেউ কারু নয় মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভূলোনা দক্ষিণা কালী, বদ্ধ হয়ে মায়াজালে।
যার জন্য মর ভেবে সেকি তোমার সঙ্গে যাবে।
সেই প্রেয়সী দেবে ছাই অনল হবে বলে॥
দিন দুই তিনের জন্য কর্তা বলে সবাই মানে।
সেই কর্তারে দেবে ফেলে কালাকালের কর্তা এলে॥

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের কালে মাষ্টারমশায় মেট্রোপলিটন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সে সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীতে সুপরিচিত রাখাল, বাবুরাম, সুবোধ, পূর্ণ প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে ঐ স্কুলের ছাত্র ছিলেন, ঐ কারণে তিনি মাষ্টারমশায় নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি যখনই সুবিধা পেতেন ঐ সব ছেলেদের ঘরে নিয়ে যেতেন শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে। সে কারণে তিনি ছেলেদের মাষ্টার নামেই অভিভাবকদের আতঙ্কের পাত্র ছিলেন। আজ দক্ষিণেশ্বরে সেই মাষ্টার ধরা দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পদতলে।

॥ গান : ৪ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ চরণ তলে আমার দেহ আমার মন।
কান্না হাসির সকল কথা সব করেছি সমর্পণ॥
আলো দাদার জীবন দোলায় কে আমারে
সকল ভোলায়।
মাটির কান্নার মাঝে যেন, পাইগো তারি দরশন।
দিনের আলো নিতে এলো এবার
তোমার প্রদীপ জ্বালো।

তোমার প্রেমে ওগো দরদী, রাঙাও আমার দুনয়ন॥

মাষ্টারের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরীয় ভাবাবেশের মধ্যে অবিবাহিত জীবনের মুখ্যতি করে মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করলেন—তার বিয়ে হয়েছে কিনা···। মাষ্টারের বিনীত উত্তর আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠাকুর পুনরায় জিজ্ঞেস করাতে জানালেন, মাষ্টারের একটি ছেলেও হয়েছে ···।

তাই শ্রীরামকৃষ্ণ নিরাশভাবে তাঁর সেবক প্রাতুষ্পুত্র রাখালকে বললেন,—ওরে রাখাল যা: বিয়ে করে ফেলেছে, ছেলেও হয়েছে ···।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকালের বিদ্যায় বিদ্যাভিমানী মাষ্টারের অহংবোধ বিচূর্ণ হল। কিন্তু তিনি অন্তরে বিদ্রোহী না হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে আজ নিবেদিত হলেন। এ যাবৎ তিনি ধর্মচর্চা উপাসনাদি যা করেছিলেন, সম্মুখে উপবিষ্ট আদর্শ ধার্মিকের দৃষ্টিতে তিনি আধ্যাত্মিক স্তরের উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি।

তখন শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে মাষ্টারকে বললেন, দেখো তোমার লক্ষণ সব ভাল —"আমি কপাল, চোখ ইত্যাদি দেখলে বুঝতে পারি ···।" ওরে কিঞ্চিত আয়ত হলেও আয়ত সামান্য বাক্যালাপে মাষ্টারের যে ধারণা ছিল মানব জীবনে বুঝিই বুঝি সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, আর যার আধ্যাত্মিক বিদ্যালাভ হয়েছে সে প্রকৃত জ্ঞানী, সে প্রকার শিক্ষাহীন ঠাকুরের নিকট তিনি জানলেন—"ঈশ্বরকে জানার নামই জ্ঞান, আর সবই অজ্ঞান ···।"

পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশ্ন—তিনি সাকারে বিশ্বাসী কিংবা নিরাকারে?

মাষ্টারের নম্র উক্তি—তাঁর নিরাকার ভালো লাগে। ঠাকুর জানালেন—নিরাকারে বিশ্বাস থাকা ভালো, তবে সাকার ও নিরাকার দুই সত্য।

ঠাকুরের অর্ধবাহ্য ভাবাবেশে গান—

। গান : ৫ ।

আমার মা যদি ভাঙা, তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা
আমি জানিগো ও দীনদয়াময়ী তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা
তুমি জলে তুমি স্থলে তুমি আদ্যা মূলে গো মা
আছ সর্বঘটে, অর্থ পুটে সাকার আকার নিরাকারা।
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা,
তুমি অকূলের ত্রাণ কর্ত্রী সদা শিবের মনোহরা
আমার মা যদি ভাঙা।

মাষ্টার পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শুনলেন—মন্দিরের দেবী মৃন্ময়ী নন, তিনি চিন্ময়ী।

মাষ্টার অমনি বলে উঠলেন— তাই যদি সত্য হয় তবে

যারা প্রতিমায় উপাসনা করেন তাদের তো বুঝিয়ে দেওয়া উচিত, বস্তুত মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয় প্রতিমায় ঈশ্বরের উদ্দেশ করে পূজা হয় মাত্র। অমনি শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন, কলকাতার লোকের ওই এক···কেবল লেকচার দেওয়া আর বুঝিয়ে দেওয়া যদি দরকার হয় তিনিই বোঝাবেন, তোমার মাথাব্যথা কেন? তোমার নিজের যাতে জ্ঞান ভক্তি হয় তার চেষ্টা করো।

মাষ্টারের বিদ্যাভিমানের সৌধ একেবারে ধূলিসাৎ হলো। তিনি বুঝলেন, তর্ক অনুভূতির বস্তু, বুদ্ধি ততদূর অগ্রসর হতে পারে না। আর তাছাড়া তত্ত্বলাভের জন্য তত্ত্বদর্শী সাধুদের সঙ্গ অত্যাবশ্যক।

। গান : ৬ ।

সাধু সঙ্গ নামে আছে পান্থ যার
শ্রান্ত হলে তথা করিও বিশ্রাম।
পথ শ্রান্ত হলে ঘুমাইও পথ
সে পান্থ নিবাসী জনে।

তদব্যতীত অতি মালিন্য বুদ্ধিও আমাদের ভগবৎ সকাশে নিয়ে যেতে অসমর্থ হয়।

এরপর মাষ্টার সম্পূর্ণরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আত্ম-সমর্পণ করে কৃতার্থচিত্ত হয়ে ঘরে ফিরলেন

। গান : ৭ ।

(ওগো) চরণে শরণ দাও,
চরণে শরণ দাও, চরণে শরণ দাও চরণে শরণ দাও
দ্বার্থ দম্ভ ভেদ ও বুদ্ধি চিরতরে মুছে যাও।

অভিমান অহংকার চূর্ণ মাষ্টার কয়েকদিন বরাহনগরে অবস্থানের সুযোগে উপর্যুপরি শ্রীরামকৃষ্ণ মিলনাতে অন্তরঙ্গজনের অন্তর্ভুক্ত হলেন। আর আরম্ভ হলো মাষ্টারের জীবনে নবতম অধ্যায়। এক সপ্তাহ পরে মাষ্টার পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে উপনীত হলে ঠাকুর সকৌতুকে ভক্তদের বললেন—একটী যন্ত্রকে আফিং-এর নেশা করানো হয়েছিল, তাই যন্ত্র নির্দিষ্ট সময়ে আফিং-এর নেশায় এসে হাজির হতো। মাষ্টারের পক্ষেও তাই···।

পরবর্তী বৈশাখের প্রথম রোদে ঘর্মাক্ত কলেবরে মাষ্টারকে আসতে দেখে ঠাকুর বললেন, এরমধ্যে কি আছে যার টানে ইংলিশম্যানরাও এখানে আসে। সাদা চোখে গৌরাঙ্গের সাঙ্গপাঙ্গ সব দেখেছিলাম। তার মধ্যে তোমাকেও যেন দেখেছিলাম। ঠাকুরের ভাবাবেশ।

। গান : ৮ ।

ঐ সুরধুনী তীরে হরি হরি বলে কে রেচে যায়।
যার গো কাঁচা সোনার বরণ
চাঁদের কিরণ মাখা গায়।
শিরে ঝোলে শিখি পাখা
রাধা নাম সর্বাঙ্গে লেখা
(ও তার) নয়ন বাঁকা ভঙ্গি বাঁকা বাঁকা নূপুর
রাঙ্গা পায়।

মাষ্টার স্বভাবতঃ লাজুক ছিলেন। মৃদাকালে একদিন মাষ্টারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, এই শালা নাচ।

লাজুক মাষ্টার লজ্জা ত্যাগ করে নাচে যোগ দিলেন আর ঠাকুরের ভাবাবেশে গান—

। গান : ৯ ।

সুন্দর লীলা নন্দদুলালা নাচত শ্রীবৃন্দাবনে
তালে চন্দন তিলক মনোহর অলোকা শোভে
কপোলন যে,
রাধা কৃষ্ণ এক তনু হায় কুঞ্জবনমে রঙ্গ মচায়

বিশ্বরূপ তো ভগবান সেজে লীলা করতে বৃন্দাবনধামে। মাষ্টারের স্কুলে পড়ার কাল থেকেই ডায়েরী লিখনের যে অভ্যাস হয়েছিল, সে অভ্যাস বশতই অতি সংক্ষেপে শ্রীরামকৃষ্ণ মিলন বিবরণ লিপিবদ্ধ করতেন। আর এ লিখনই ছিল, কর্মব্যস্ততার মধ্যে তাঁর মনের খোরাক। শ্রীরামকৃষ্ণ মিলনের ১৮৮২ থেকে '৮৬ পাঁচ বৎসরের কয়টী প্রায় নিত্যকার দিবসের, চিত্রই মাষ্টারের ডায়েরী থেকে উদ্ধৃত হতে আরম্ভ করে। মাষ্টার স্বকর্ণে যা শুনেছেন স্বচক্ষে যা দর্শন করেছেন সে সবই তাঁর একান্ত অনুগত সাধুভক্ত ব্যক্তিকে ডায়েরী অবলম্বন করে যান যোগে যা বলতেন তাই মুদ্রিত হয় "কথামৃত" রূপে।

বেদ বেদান্ত বাইবেল প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য দর্শন ও গীতা ভাগবতাদি তিন মাষ্টারের অধিগত। তাই ভাগবতে গোপী গীতার শ্লোকাংশ অবলম্বন করে শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত ও অমৃতকথা পরিবেশিত হয়।

। গান : ১০ ।

তব কথামৃতম্ তপ্ত জীবনম্ কবিতিরীড়িতং
কল্মষাপহম্

ভবপয়োদলং শ্রীমদাততম, তুমি গৃণতি যে ভূরিদা জনাঃ। মাষ্টারের জীবন যথার্থ সাধুসঙ্গে একেবারে পরিবর্তিত হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে মিলন প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকে দিব্য হীন কণ্ঠে ব্যক্ত করলেন—আমার মনে হয় খীশুখ্রীষ্ট চৈতন্য ও আপনি এক।

শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরে অসুস্থ অবস্থায় থাকা কালেই পুণ্যভূমি শুরু ধাম কামারপুকুর দর্শনে গিয়েছিলেন। তৎকালের দুর্গম পথে পদযাত্রা করে। অন্তরে শুরু বন্দনা করতে করতে।

। গান : ১১ ।

বন্দি কামারপুকুর পুণ্য লীলাভূমি
যেথা নরলীলা তরে অবতরিলা তুমি
রূপ লাবণ্য খনি গদাধর চাঁদ
অনিমেষে নিরখিয়ে না পূরিল সাধ।
জগতের নাথ তুমি জগতে আপ্রয় হে
ধরাভার নিবারিতে ভূতলে উদয় হে।
রামকৃষ্ণ দাসে কয় কি দিব হে পরিচয়
আপ্ত তুমি ত্রিভুবন স্বামী
(কি) দিব তব উপমা দিবাকরী না পায় সীমা
তোমার তুলনা নাথ তুমি।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গলাভের পর মাষ্টারের ইচ্ছা হত ছোট বড় সকলেই যেন দক্ষিণেশ্বরের সেই মহামানবকে দর্শন করে মানব জন্ম সার্থক করেন। তাই তাঁরই উদ্যোগে বাহুড় বাগানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন হয়। সেই শুভ মিলনের চিত্রটি তথা প্রসঙ্গ ইতিহাসে অতুলনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এতদিন খালবিল হদ্দ নদী দেখেছি, আজ সাগরে এসে মিললাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় বললেন, তবে নোনাজল খানিকটা নিয়ে যান। তাতে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি—তা কেন? তুমি তো বিদ্যাসাগর, ক্ষীর সমুদ্র।

। গান : ১২ ।

বিদ্যার সাগর তুমি, দয়ার সাগর
খাল বিল নহো তুমি, নহো নোনাজল
পিতা হতে তুমি লভিলে জ্ঞান
মাতার নিকটে তুমি "সাত রাজার ধন"
জননীর সাথে তুমি পেলে জগন্মাতা
(তাই) ঘরে ঘরে দেখি আজ তোমার আসন পাতা।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত নিজে গুপ্ত থেকেই বিশ্বজনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মিলন চিত্র উপহার দিয়ে অমর হয়ে রইলেন।

পিতৃবিয়োগের পরে বিলে—নরেনের মায়ের হাতে গোপনে টাকা দিয়ে মাষ্টারমশায় বলতেন মা এ সামান্য টাকা গ্রহণ করুন, নরেন যেন জানতে না পারে। এ প্রকার তাঁর অসংখ্য গোপন দান।

মাষ্টারমশায় শুধু যোগী, শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপায় তাঁর সাধন,—লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকতে নয়। সেকালের কলিকাতায় সদ্য শিক্ষাব্রতী, তৎসত্ত্বেও তিনি জগন্নাথের এবং মহাপ্রসাদের এত অনুরাগী ছিলেন যে নবদ্বীপে হাওড়া স্টেশনে এসে জগন্নাথ দর্শনান্তে যাত্রীদের কাছ থেকে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করে নিতেন।

সাধন প্রভা সমুজ্জ্বল শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী লজ্জাশীলাব্রতা সারদাদেবীকে তিনি গুরুবৎ সেবা আর তাঁর পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করে আদর্শ গুরুরূপে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন।

স্বদেশের তত্ত্বজ্ঞানার্থী শুচি শিক্ষাব্রতী যেমন মাষ্টারের সমীপে হরিকথা শুনতেন তেমনি বিদেশীয় তত্ত্বজ্ঞানার্থীরাও যথার্থ ভারতীয় যোগী দর্শনের জন্য শ্রীর সমীপে সমাগত হতেন। তাঁদের মধ্যে Paul Brunton এবং Rev. Kelley শ্রীমায়ের সাথে বাইবেল আলোচনা করতেন।

আর শ্রীরামকৃষ্ণকে যাঁরা জীবনের ধ্রুবতারা করেছেন সেই সব সাধু সন্ন্যাসী, যথা, বিরজানন্দ, মাধবানন্দ, যদুনন্দ, যতীশ্বরানন্দ, রাঘবানন্দ, কৈলাসানন্দ প্রভৃতি সারদা রামকৃষ্ণ পরাশ্রয়ী সাধুগণ মাস্টারমশায়ের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবত কথা শুনে সাধনপথে অগ্রসর হয়েছেন। সুদূর শ্রীহট্টের ইন্দ্র দয়াল ভট্টাচার্য ১৯১১ সনে কলকাতায় এসে যখন শ্রীম সমীপে শ্যামাসঙ্গীত গেয়েছিলেন তখন সেই সঙ্গীতমুগ্ধ শ্রীম বলেছিলেন, তুমি যে শ্যামা সঙ্গীত গাইলে সেই শ্যামাই দেহধারণ করে বিরাজ করছেন অন্নপূর্ণামন্দিরে। সেই ইন্দ্রদয়াল শ্যামদায়িনী সারদা দেবীকে দর্শন করে আর কৃপালাভান্তে শ্রীহট্টে রামকৃষ্ণ ভাব প্রচার করে অনেক সঙ্গীত সাধন করেছিলেন। আর শ্রীমকে এই মর্মস্পর্শী সঙ্গীত শুনিয়েছিলেন—

। গান : ১২ ।

বহুদূর গোমুখী হইতে করুণাধারা বহিয়া যায়
এসো ছুটে এসো কে আছ মানব শুষ্ককণ্ঠ পিপাসায়
ব্যর্থ বাসনা অনলদহন, সহিলে কত না জনম-মরণ
আলেয়ার পাছে ছুটিতে ছুটিতে মরুসলিলসিকতায়
স্নিগ্ধসলিলে বারেকও ডুবিলে সকলও জ্বালা-
জুড়াবে তায়
জাহ্নবীতীরে তৃষ্ণা কাতর অন্ধ যে জন খোঁজে সরোবর
ধাম কৃষ্ণ পূতঃ গঙ্গা ব্রহ্মানন্দ সাগরে যায়
হোক অবসান ব্যর্থ প্রয়াণ এসো ছুটে এসো।
ধরি গো পায়।

মাস্টারমশায় শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাময় জীবন উৎসর্গ করে ১৩৩২ সনের ৪ঠা জুন নিজের ঠাকুর বাড়ীতে দেহত্যাগ করেন। তাঁর শেষ নিবেদন ছিল, মা আমায় কোলে তুলে নাও।

। গান : ১৩ ।

কোলে তুলে নে মা শ্যামা আমি যে তোর
অবোধ ছেলে
আমি যদি থাকি ভুলে মেয়া কোলে
ছেলে বলে।

। গান : ১৪ ।

রামকৃষ্ণ ভজ রামকৃষ্ণ পূজ রামকৃষ্ণ নামে মজো মন
যুগযুগান্তরে আঁধারে ঘুরে ঘুরে পেয়েছি কত যন্ত্রণা।
রামকৃষ্ণ জ্ঞান রামকৃষ্ণ ধ্যান রামকৃষ্ণ নামে
হয় পরিত্রাণ
রামকৃষ্ণ ভক্তি রামকৃষ্ণ মুক্তি রামকৃষ্ণের তত্ত্ব
সাধু নাম।
ভোগ বাসনায় করিয়েছ খেলা চেয়ে দেখো ঐ
গেলো গেলো বেলা
সত্য পথ ধর অসত্য পরিহর ঐ পদে শরণ লহো মা।

গান

শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বুকে করে রাখবো তোমায়
তুমি যে মোর ধ্যানের ধন
আন কথায় ভুলবো না আর
করবো না আর অন্য মন।
কাজ কি পূজা উপচারে
নাই বা বাজলো বাদ্যযন্ত্র
ভক্তিফুলে সাজায়ে মা'রে
মুখে বলবো মা-মা মন্ত্র।
সকল কাজে সবার মাঝে
ডাকবো তোমায় অনুক্ষণ।...
ডাকার মতো শক্তি দিও
ভক্তি দিও হৃদয় ভরে
আজ্ঞাচক্রে উঠুক এ মন
থাকুক তোমার চরণ ধরে।
প্রাণের আবেগ যদি কমে
তুমি মোরে আঘাত দিও
ব্যথা দিয়ে আঘাত দিয়ে
মনের মতো করে নিও।
অহমিকা নাও তুলে মা—
অভয় চরণ দাও মা শরণ।...

তন্ত্রম্

জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়

বেদে ব্রহ্ম উপাস্য 'নারায়ণ' তন্ত্রে উপাস্য 'নারায়ণী'। অগ্নি এবং দাহ্য, রস এবং জল যেরূপ অভেদ নারায়ণ ও নারায়ণী তদ্রূপ অভেদ। এই অদ্বৈতবোধ লাভ জন্য অদ্বৈত তন্ত্রে পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে বিগ্রহ করা হইল এবং তন্ত্রে অদ্বৈত রূপিনী "কালী" নারায়ণী বিগ্রহ। জগতের সর্বজ্ঞান বিজ্ঞানকে সংগ্রহ করিবার মুক্তির সাধনার সিদ্ধি জন্য তন্ত্রের প্রয়োজন।

তন্ত্র প্রাণীগণের চরিত্র নিরীক্ষণ করে এবং তাহার সংস্কার করে। আজকাল তন্ত্র বলিতে লোকে ধারণা করে যে, মদ্যপান, মাংসমীন ভোজন, মুদ্রাকরণ প্রভৃতি পঞ্চ 'ম' কার। ইহা যাঁহারা করেন তাঁহারা কোথাও ঘৃণ্য এবং কোথাও পূজ্য হয়েন। ইঁহারা সত্য আচারী। এই সকল আচরণে বহু তান্ত্রিক বাধা নিষেধ পালন করিতে হয়। তাহার ফলে সংযম ও পরে আত্মসংযম হয়। কিন্তু যাহারা তান্ত্রিক বাধা নিষেধ পালন করে না মদ্যপ, মৎস্য, মাংসাশী এবং মুদ্রালোভী তাহারা স্বভাবতঃ মিথ্যাচারী হইয়া যায়। ইহারা পতিত পাষণ্ড। সুতরাং পতিত সত্য ও পশু আচারী উভয়ের পার্থক্য দেখা যাইতেছে। তন্ত্র সহজ বস্তু নহে। তন্ত্রের আদ্যাদেবী জীবন্মুক্তা সনাতনী। যিনি এই জগৎকে ধারণ করিতেছেন।

সংসারে উপাসক, উপাসনা এবং উপাস্য এই ত্রয়ী বিদ্যা নিত্য বর্তমান। এই তিনটি একত্র হইলে একটি ধ্যান হয়। ধ্যান, ধ্যাতা এবং ধ্যেয় এই তিনটি একত্র হইলে একটি জ্ঞান হয়, জ্ঞানই তন্ত্র। জ্ঞানম্ সন্ন্যাস লক্ষনম্। অতএব দেখা যাইতেছে তন্ত্র মহাবিদ্যা। 'ব্রহ্মবিদ্যা' সর্বভূত এবং সিদ্ধি বিদ্যা। সচ্চরিত্রতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, নির্ভয়ে সত্যবাদী না হইলে তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। ইন্দ্রিয় ইহা শুদ্ধ না হইলে তন্ত্র সাধনা সিদ্ধ হয় না।

তান্ত্রিক অন্তঃ শত্রুগণ (কাম, ক্রোধ)-কে প্রথম বধ করিয়া পরে বহিঃশত্রুবধে উদ্যত হইলে দেখিতে পান "বিশ্বম্ প্রিয়তরম্" বিশ্ববাসী সকলেই তাঁর সম। এই জ্ঞান হইবার জন্য ইনি সর্বজনপ্রিয় হন। ইনি তন্ত্রাচারে সিদ্ধিলাভ করিয়া পরে দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য তপস্যা করেন। ধর্ম স্থাপনে (আচরণে) সদা উদ্যত থাকেন। দেশকাল পাত্র ভেদে আমিষ নিরামিষ ভোজী হন। ইনি সতীগণকে শ্রদ্ধা করেন। স্ত্রী জাতি মাত্রেই মাতৃ সম্বোধনে পূজা করেন। ইনি সকলের উপকারের জন্য সৎ উদ্দেশ্য না থাকিলে মদ্যপান করিবেন না। 'পরতরাম কল্পসূত্রম্' অনুসারে বীরাচার অনুশাসন গ্রহণে এই তান্ত্রিক ব্যক্তি রুদ্রতুল্য হইয়া যান এবং দিব্যাচারে প্রবেশ করেন। দিব্য আচারীগণে লোকে বিস্ময়কর 'মহাপুরুষ' বলে জ্ঞাত হয়। ইনি বেদ, তন্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি, কোরাণ, বাইবেল গ্রন্থকার ইত্যাদি সকল ধর্মমত এবং পুস্তককে একই দেখেন। ইনি সকল বস্তুকেই পঞ্চমাত্র ব্রহ্ম ইহাই জানেন। ইনি প্রত্যেক পদক্ষেপে রসজ্ঞময়। সদা পরোপকারী, জীবন্মুক্ত এবং দেশের তথা জগতের স্বাধীনতম ব্যক্তি। হইয়া অবস্থান করেন : জীবন্মুক্ত এবং দেশের তথা জগতের স্বাধীনতম ব্যক্তি ইহাই মনুষ্যত্বের অন্তিম গতি। মহা মনুষ্যত্ব। ইতি শ্রীমৎ বিশ্বপ্রণব অভ্যাশ্রমিন মহারাজের তাবধারার সর্বতন্ত্র কথা। অলমিতি—

সম্পাদকীয় নিবেদন

[৩১ পৃষ্ঠার পর]

ভাবাদর্শ সঠিকভাবে প্রতিফলিত হবে, এটাই স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেব এই পত্রিকার শুধু যে প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তা নয়, পরন্তু তিনি ছিলেন এর যথার্থ রূপকার। অজস্র রচনায় সমৃদ্ধ করেছেন তিনি এই পত্রিকাটিকে। তাঁর প্রভাবে ও সান্নিধ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু জ্ঞানী, গুণী, বিজ্ঞানী, সাহিত্য-সেবী, কবি, দার্শনিক, প্রবন্ধকার এবং শিল্পী তাঁদের রচনা সম্ভার দিয়ে পরিপুষ্ট করেছেন ভাবমুখে পত্রিকাকে। সশ্রদ্ধচিত্তে আমরা তাঁদের অবদান স্মরণ করি।

শ্রীশ্রীসত্যানন্দদেবের নীতি নিষ্ঠা ও বিশুদ্ধিবোধ ছিল অতুলনীয়। তাই দিবাসাহিত্য রচনায় তিনি এতটুকু শিথিলতা বা মলিনতা সহ্য করতে পারতেন না। বৃথা বাক্য অথবা নিম্নমানের শব্দ প্রয়োগ তাঁর কাছে অমার্জনীয় ছিল। তিনি সদা-সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন যাতে ভাবমুখে পত্রিকার মান কোনো দিক্ দিয়ে অবনমিত না হয়।

১৩৫১ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ পত্রিকার পাঁচটি বর্ষ অতিক্রান্ত হবার পর, 'আমাদের কথা' এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীসত্যানন্দদেব লিখেছিলেন, 'জগৎ তরঙ্গময়। বিশ্বও এমনি তরঙ্গায়িত। সেই তরঙ্গে আমরা দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পার হয়ে এসেছি—শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব বহন করতে চেয়েছি। তার সাফল্য শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণ-বিকয়ে। কর্মেই অধিকার তিনি দিয়েছেন—'ভাবমুখে থাক' শ্রীসরস্বতিনীর বাণী ঠাকুরের প্রতি।' যখন সমাধির সম্ভোগ হতে মন নামতে চায় না, যখন পৃথিবীতে অবতারের পরিবর্তন প্রয়োজন হল, মা'র লীলার প্রয়োজনে তখনই মায়ের দুলালের প্রতি মা'র এই বাণী 'ভাবমুখে থাক'। সেই ভাববাদ আজ জগতের প্রধান বাদরূপে পরিগণিত।'

ভাবমুখের একাদশ বর্ষে 'ভাবমুখের কথা' নামক প্রবন্ধে শ্রীশ্রীসত্যানন্দদেবের উক্তি :

'ভাবমুখে থাকার নির্দেশ শ্রীঠাকুর তাঁর সন্তানদের দিয়ে যে ধর্ম তথা কর্মচক্র প্রবর্তন করেন, তার ফলে বিশ্বের যে কি কল্যাণ হয়েছে, ইতিহাস তার সাক্ষী। ভাবমুখের পৃষ্ঠায় শ্রীঠাকুরের সেই বিশ্বজনীন কৃপা বর্ষিত হোক, যে কৃপায় মঙ্গল-লীলায় নিত্য নিত্য এগিয়ে যাচ্ছে চরৈবেতি 'এগিয়ে পথ' মন্ত্রে।'

ভাববাদ বা idealism-এর প্রতিষ্ঠা করে আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন, মনস্তত্ত্ব সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের নানাবিধ দৃষ্টি কোন্ থেকে এ-তত্ত্বের বিচার তিনি করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি ভাবমুখের পুরাতন পাঠকবৃন্দের কাছে অল্প-বিস্তর পরিচিত। সেইসব আলোচনার সারাংশ অপেক্ষাকৃত নবীন পাঠকদের জন্য অতীতের পৃষ্ঠা থেকে নিয়মিতভাবে সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হতে পারে।

আত্মসমীক্ষণের দৃষ্টিতে, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃপক্ষ এবং ভাবমুখে পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী চিন্তাভাবনা করছেন, কীভাবে পত্রিকাটির ঐতিহ্য ও আদর্শনিষ্ঠা বজায় রাখা যায়। এ বিষয়ে চিন্তাশীল লেখক, লেখিকাবর্গের অভিমত ও সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

দেশে পত্রপত্রিকার অভাব নাই, তবু একথা অস্বীকার যায় না যে, ভাবাদর্শে সমুজ্জ্বল পত্রিকাসমূহের সংখ্যা সীমিত। যে-উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ভাবমুখে পত্রিকা আজ হতে ছত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রবর্তিত হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য ও ভাবাদর্শ প্রবহমান রেখে সকলের পথ নির্দেশক হোক, সম্পাদকমণ্ডলীর এই কামনা।

সত্যানন্দ তীর্থের সন্ধানে

অরুণা মুখোপাধ্যায়
অ্যাডভোকেট হাইকোর্ট-ডিপ্লোমা—ইন জার্নালিজম

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

পূর্ণিমা রাতের চাঁদটিও যেন সত্যানন্দের মূর্ত প্রতীক হিসাবে বিরাট থালার তায় তাঁর উজ্জ্বল চন্দ্রিকা ছড়িয়ে দিয়েছিল শ্যাম সোহাগিনীর খেলার স্থান সেই প্রকাণ্ড তমাল গাছের তলে। বাগানের চারিদিকে যেন মিষ্টি ফুলের সৌরভ, কদম ফুলের সৌরভ সত্যানন্দ প্রীতি হয়ে মানুষের মনকে আকৃষ্ট করেছিল। মন্দিরে আরতি গীতি শেষ হবার পর মায়েদের সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হলো—ওঁরাও বিস্ময় আনন্দে হতবাক্ হলেন। অপিতামা আর অনামাপুরী দুদীর হাসি নিয়ে আমাকে শুধু বললেন—"ঠাকুরের তোমার উপর বিশেষ কৃপা তাই আমাদের হঠাৎ এমন ক'রে দুবরাজপুরে আসা হলো তোমার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটবে বলে। আর আমরা এসেছি এখান থেকে ঠাকুরের অনেক স্থান ঘুরবো বলে, রামবন, বজ্রেশ্বর ইত্যাদি। তুমি আমাদের সঙ্গেই ঘুরবে আর আমাদের সঙ্গেই কলকাতা ফিরবে।" সুবমাদি (সুবোধাপুরী) বললেন—"আমি দেখছি আজ বছর দুই হলো তুমি চেষ্টা করছো এখানে আসবে বলে ; তবে তোমার চেষ্টার মধ্যে আন্তরিকতা আর ধৈর্য ছিল বলেই ঠাকুর এমন ক'রে তোমার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটালেন।" সত্যই সেদিন মায়েদের সঙ্গে যোগাযোগে সত্যানন্দ প্রীতি অনুভব করেছিলাম। এরপর মন্দিরের বাইরে বসে বাল আলুভাজা, বাদাম ও চা খেলাম পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে মায়েদের কাছে। প্রসাদ খেয়ে কলে হাত ধুতে গিয়ে বাসি মহারাজের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার মানসিক দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব অনুভব করেই তিনি বললেন—"এখার ত' আপনার কোন অসুবিধেই নেই, মায়েদের সঙ্গ পেয়ে গেছেন।" আমি সেদিন সেকথায় সমর্থন জানিয়ে কৃতজ্ঞতার হাসি হেসেছিলাম।

সেদিন রাত্রে মায়েরা ভাত খাবেন বলে আমাকেও জিজ্ঞাসা করলেন কি খাব রাত্রে। আমিও মায়েদের সঙ্গে ভাত খাব বলেই জানালাম। যে ছেলে দুটিকে রান্নার কাজে দেখলাম, খুবই নম্র আর বিনয়ী বলে মনে হলো। আমার যে কদিন দুবরাজপুরে ছিলাম ছেলে দুটি অনেক রকম তরকারী খুব ভাল করে রান্না ক'রে খাওয়াতো। আমাদের যাতে কোনরকম কষ্ট না হয় তার জন্য ওদের প্রাণপণ চেষ্টা আর আন্তরিকতা তোলার নয়। ছেলে দুটির নাম জানালাম গৌতম মজুমদার ও তপন মজুমদার। গৌতম শুনলাম এক বছর হলো কাজ করছে। ঠাকুর সেবা আর রান্না করাই ওর কাজ। ভোর ৪ টের উঠে মহারাজের চা দিত গৌতম আর তারপর মহারাজ যা দিয়ে আমাদেরও চা দিয়ে যেত ও স্নানের জন্য কেটলী ক'রে গরম জল। গৌতমের কাছে শুনেছিলাম ও প্রায় ১২ জনের রান্না করে ও এই রান্না শুরু হয় ৯ টা থেকে—ভাত, ডাল, তরকারি ঝোল ইত্যাদি রান্নার পর ওকে তৈরী করতে হয়। এই কাজ চলে ওর প্রায় ২টো পর্যন্ত। তারপর চারটের সময় চা তৈরী ক'রে ওর কাজ আবার চলে ৭টা থেকে রাত্রি ১১টা। আমি নিজে আইনজীবি হলেও সাংবাদিক হিসেবে সাংবাদিকতা করা আমার হলো নেশা। তাই ঠাকুরের দীক্ষিতা কন্যা রূপে ঠাকুরের কৃপা বারি স্পর্শ অনুভব করি এই জগতের কোলাহল মুখরিত মানুষের সুখ দুঃখ আর হাসিকান্নায়। সাধারণ মানুষদের মধ্যে গৌতমকেও একজন মনে করে তার জীবনের সুখ দুঃখের কাহিনীকে জানতে চেষ্টা করেছিলাম। খুব ভোরে গৌতম যখন আমার ঘরে মাটির ভাঁড়

আর চায়ের কেট্‌লী নিয়ে ঢুকলো। তখন শুধু একটি কথাই আমার মনে হলো সত্যানন্দ তীর্থে এই ছেলেটি কেমন করে এলো। তাই স্মৃতির পাতায় ধরে রেখেছি ছেলেটির জীবন কাহিনীর দু' একটি টুকরো দৃশ্য। শান্তনিষ্ট এই ছেলেটি শুনলাম Class IX পর্যন্ত পড়েছে। তারপর বাড়ীতে খুব অভাব মা, বাবা, দাদা, ভাই বোন সবই আছে ; কিন্তু সবকিছুর মধ্যেই শূন্যতা। "জীবনে কোন লক্ষ্য স্থির করতে পারছি না দিদি। বাবার কোন কাজ নেই। দাদা সামান্য কাজ করে। তাই খরচ ; মা অসুস্থ ; একটি মাত্র বোন বিয়ে ক'রে চলে গেছে", কথাগুলো বলতে গিয়ে গৌতম আশ্রম প্রাঙ্গনের দিকে হতাশ ভাবে চোখ মেলে চাইছিলো। গৌতমকে দেখে আমার প্রায়ই একটি কথাই মনে হতো যে ঠাকুর যেন ওকে ব্যর্থতার জীবন থেকে সরিয়ে এনে আর একটু স্বাচ্ছন্দের জীবনের আলোক রশ্মি দেন। তপন মজুমদার বলে আর একটি ছেলেকেও দেখেছিলাম সে ঠাকুরের পূজো করে ও ছেলেটি শার্পস স্কুলের peon ঐ ছেলেটিও আমাদের যত্ন করেছিল আন্তরিকতার সঙ্গে। আশ্রমে যে ছেলেটি সন্ধ্যারতি করতো তার নাম ছিল প্রদীপ নাথ—শুনলাম সে লেখাপড়াও করে আবার ঠাকুরের খাজারও করে। ছেলেটিও খুব নম্র আর বিনয়ী দেখলাম।

দুবরাজপুরের আশ্রমে মহারাজ হলেন স্বামী কৃপানন্দ। প্রথম দিনেই দুবরাজপুরে রাত্রি ৯ টা নাগাদ গোস্বামীকে দর্শন করতে গেলাম মায়েদের সঙ্গে। স্বামিজীর শরীর বেশ ক্লান্ত দেখলাম। তবে সত্যানন্দ কৃপায় তাঁর দেহকান্তি অটুট দেখলাম। একমনে বসে তিনি মালা জপ করছিলেন। ঘরে অসংখ্য ধর্ম পুস্তকের স্তূপ দেখলাম—ঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তিও রয়েছে। স্বামিজীকে মায়েদের সঙ্গে আমিও প্রণাম করলাম। সুষমাদি আমার পরিচয় দিয়ে স্বামিজীকে বললেন—"খুব সরল আর Simple" ; মহারাজও ঠাকুরের কৃপায় আমার প্রশংসা ক'রে বললেন--"ভাবমুখে এর অনেক লেখা পড়েছি ; লেখার ধরণ দেখলে মনে হয় সে কথা।" এবার আমি কটিকথার চিঠি দেখালাম। চিঠিটি পড়ে স্বামিজী মায়েদের বললেন—"তোমরা দেখো এই মা'টিকে। আমার তো শরীর খারাপ ; দেখাশুনোর কর্মীও তেমন নেই।" মায়েরা স্বামিজীকে বললেন—"মহারাজ আপনার ক্ষমতা কি কম ? আপনি যে ভাবে Building তুলছেন একের পর এক, দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যার্থীভবন ইত্যাদি ইত্যাদি তার জন্য কতখানি শক্তির প্রয়োজন বলুন তো।" স্বামিজী সত্যানন্দ গর্বে উল্লসিত হয়ে বললেন—"এসব আমি কিছুই নই ; ঠাকুরই সব করিয়ে নিয়েছেন ; তবে কি জানো রাসবিহারী যে ভাবে অসংখ্য বাধা আর ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিরাট আশ্রম মন্দির সত্যানন্দ তীর্থ গড়ে তুললো তার কাছে আমরা সবাই হেরে গেলাম। ও সবাইকে হারিয়ে দিয়েছে". স্বামিজীর কথার মধ্যে সেদিন একটা জ্যোতি অনুভব করেছিলাম। মায়েরাও সবাই একবাক্যে স্বামিজীর কথার প্রশংসা করলেন ও তাঁরাও এবার আমাকে নিয়ে রাসবনে যাবেন বলে জানালেন। স্বামিজী সেদিন আমাদের জানালেন পরের দিন সকাল ৯ টায় তিনি আমাদের নিয়ে "অরুদেব" ও তারপরের দিন "বক্রেশ্বর" যাবেন আশ্রমের গাড়ীতেই। রাত্রি অনেক হয়েছিলো বলে আমরাও এবার ওঁকে প্রণাম ক'রে নীচে নামলাম।

আশ্রম প্রাঙ্গনে নেমে দেখি চাঁদের আলো মাখানো আকাশের তলায় ঘনকালো ডালে গোলাকারে আবৃত তমাল গাছটি সত্যানন্দ প্রীতির পরশ বহন ক'রে আমাদের সামনে দণ্ডায়মান। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বেশ ঠাণ্ডার ভাব অনুভব করেছিলাম। মায়েরাও মাথায় কাপড় দিয়ে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। আমিও চাদরটা চেকে নিলাম। আশ্রমের দুরভাষটী ভবনের একতলার একটি সুন্দর ঘরে আমি ছিলাম। এই দুরভাষটী ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন সন্ন্যাসিনী অর্চনাপুরী—৩।১।৭৬ তারিখে।

রামকৃষ্ণ আশ্রমে মায়েদের সঙ্গেলাভ ক'রে আমি এত পরিতৃপ্ত হয়েছি যে বলার নয়। অপিতামাকেন্দ্র'

দেবলাম মাতৃরেহে ভরপুর ; যেন সবাইকেই আপন সন্তান ক'রে নেওয়ার ভাব। হাত ভেঙে যাওয়া পায়েতেও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে একমনে সব কাজ ক'রে চলেছেন ; মুখে মিষ্টি হাসি। সন্তানস্নেহ প্রীতি দিয়ে হাতে ক'রে বাবায় খাইয়ে আমাকে যেভাবে খাইয়েছেন সে কথা কোনদিনই ভোলার নয়। অমায়াপুরীকেও দেখলাম সবসময়ই ঠাকুরময় হয়ে যেন কর্মীর ভাব। ঠাকুর সত্যই তাঁকে কৃপা করেছেন। কাজের দিকেই যেন সবসময় মন। ঠাকুরপুজো আর ঠাকুরের সেবাকে তিনি মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছেন। তাই সেদিন আমার অপটু হাতের বাবায় খাওয়ানো দেখে তাঁর বোধ হয় খুব অস্বস্তি হয়েছিল। তাই মাঝে মাঝে তিনিও বাবায় খাইয়ে দিচ্ছেন। সুষমাদির (সুবোধাপুরী) মধ্যে কিন্তু দেখেছি এক ব্যতিক্রম। দুবরাজপুর, সিউড়ী ইত্যাদি স্থানে বাসে, রিক্সাতে চেপেও তিনি ঠাকুরের সংগঠনের প্রয়োজন বোধে সন্ন্যাসিনীর কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য কঠোরভাবে তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করেছেন। ঠাকুর সন্ন্যাসিনী মায়েদের বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ভাবে যে গুণের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তার বিচিত্র রূপ আমার মত ক্ষুদ্র মানুষের কাছেও ধরা পড়েছিল। কর্মীর ভাব আর আধ্যাত্মিক বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্নতা মনের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে এই মাটির মধ্যে—সবই ঠাকুরের কৃপা। সুষমাদি বলেছিলেন তাঁকে বাইরে জগতে চলাফেরা খুব বেশীই করতেহয়েছিল ও সারাজীবনই প্রায় Struggle করতে হয়েছে ; তাই তাঁর বাইরের জগতে চলাফেরা করার বুদ্ধি আছে বলেই বোধহয় তাঁর নাম দিয়েছিলেন ঠাকুর সুবোধাপুরী। সন্ন্যাস নেবার সময় তিনি তাঁর বাড়ীতে মা বাবাকে দেখার জন্য থাকার অনুমতি পেয়েছিলেন ঠাকুরের কাছে। মাতৃস্নেহে ভরপুর সুষমাদি একদিন ভ' ঘোপালের ভোগের রসগোল্লা দুবরাজপুরে আমাকে একের পর এক চারটে খাওয়ালেন ; আমি প্রতিবাদ করতে গেলে কঠোর হয়ে মৃদু হাসি দিয়ে বলেছিলেন "ঠাকুরের মেয়ে তোমরা খাবে না কেন ? দুবরাজপুরে আমি খাটে শুতে আপত্তি করাতে ও মায়েদের সঙ্গে মাটিতে শুতে চাইলে তিনি মাতৃস্নেহে বলেছিলেন—"ঠাকুরের ইচ্ছা তুমি একটু আরাম করো। কারণ ঠাকুর যাকে যেমন ঠিক তেমনটি দিতে চাইছেন। ভক্তদের সেবা করা আমরা ঠাকুরের কাছেই শিখেছি। তুমি সারাবছর পরিশ্রম কর ; এখন তোমার বিশ্রামের দরকার। সারাদিন মায়েদের সঙ্গে থাকো কিন্তু রাত্রে তুমি খাটে শোবে। আমরা ছোট থেকে ঠাকুরের কাছে এসেছি। সুতরাং ঠাকুর কি চাইতেন সেটা আমরা ভাল করেই শিখেছি।" স্নেহভাব সম্পন্না সাধু মায়ের মুখে এমন কথা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছিল।

দুবরাজপুরের প্রথম রাত্রে ঠাকুরের কৃপায় উৎকৃষ্ট খাদ্য পরম তৃপ্তি, ডাল, আলুপোস্ত, ফুলকপি আলুর ঝোল খুব তৃপ্তি ক'রে খেলাম। শেষে অবশ্য দুধও বাদ যায়নি। আমরা সবাই ওখানে রাত্রে বেশ ভাল ঘুম ঘুমোলাম।

দুবরাজপুরে আশ্রম প্রাঙ্গনটি বিরাট দেখলাম। সর্বত্রই ঠাকুর সত্যানন্দদেবের বিরাট কৃপার নিদর্শন বহু বিদ্যাপীঠ, হাসপাতাল ও গানের স্কুল এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এসব প্রতিষ্ঠানের বিষয় বৃত্তান্ত হলো এইরকম—যেমন,

(১) শ্রীশ্রীসারদা বিদ্যাপীঠ—(V to XII) ১১০০ জন ছাত্র সংখ্যা।

(২) শ্রীশ্রীসারদা ভূমিহারী বিদ্যাপীঠ—৪৫০ জন ছাত্র সংখ্যা।

(৩) শ্রীশ্রীসারদা প্রাকৃবুনিয়াদি বিদ্যাপীঠ – ৪০ জন

(৪) শ্রীশ্রীসত্যানন্দ সুরভারতী (গানের স্কুল) ১২ জন

(৫) শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী বিদ্যামন্দির (V to VIII) ২৫০ জন

(৬) শ্রীশ্রীঅভেদানন্দ সেবাসদন (দৈনিক রোগীর সংখ্যা ১০০ জন)

(৭) দরিদ্র নারায়ন সেবাসত্র—৪০০ জন

(৮) শ্রীশ্রীসারদা বিদ্যার্থী ভবন—৩২৩ জন

(৯) শ্রীশ্রীঅভেদানন্দ আশ্রমাধীন চিকিৎসা কেন্দ্র (৯ দিন)—গড়ে দৈনিক ৭০ জন

(১০) শ্রীশ্রীসত্যানন্দ প্রতিষ্ঠান শিক্ষানিকেতন (ইংরাজী মাধ্যম) K, G. School ৫৮ জন

তবিষ্যতে মেয়েদের পড়াশুনোর সুবিধার্থে কলেজ করারও ইচ্ছে আছে শুনলাম। উপরোক্ত বিষয় গুলোও দুবরাজপুর আশ্রমের সন্তোন মহারাজের কাছে আমি পেয়েছি ও সেজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

দুবরাজপুরে পৌঁছনোর পরেরদিনই আমরা সকাল ৯ টার মধ্যে স্নান সেরে তৈরী হয়ে নিলাম, জয়দেব যাব বলে স্বামী ভূপানন্দের কথামত। বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল। গায়ে চাদর জড়িয়ে ফুল তুলে ঠাকুরের পুজো শেষ ক'রে আমরা যখন সবাই মিলে বাগানে এসে দাঁড়িয়েছি ঠিক সেইসময় খুব গরম চায়ের কেটলী আর মাটির অনেক ভাঁড় নিয়ে গৌতমের আবির্ভাব ঘটলো। একের পর এক মাটির ভাঁড় ভর্তি ক'রে গরম গরম চা চিনেবাদাম সহযোগে আমরা খেলাম ও এর অল্পক্ষণ পরেই স্বামিজীর সঙ্গে আমরা গাড়ীতে উঠে বসলাম। আমাদের সঙ্গে স্বামিজী, সন্তোন মহারাজ ও রামধনের সুবোধ মহারাজও ছিলেন। (ক্রমশঃ)

—:০:—

গান

শ্রীশরণা পুরী

যে ফাগুন কুঞ্জবনে
ভ্রমর আসে না
সে ফাগুন কেন আসে
কেনই বা আসে,
যে ফাগুন প্রজাপতির
পাখা গোনে না
সে ফাগুন কেন আসে
কেনই বা আসে।
যে ফাগুন বকুল চাঁপায়
কথার ব্যাথায়
প্রলাপ জাগে না
যে ফাগুন কনক করা
যেমন ধরা
চরণ ধানে না

সে ফাগুন কেন হাসে
কেনই বা হাসে
যে ফাগুন নীল অতলের
মন মহলের
খবর জানে না
যে ফাগুন আকুল করে
ব্যাকুল করে
পরাণ টানে না
সে ফাগুনে কেই বা চায়
কেই বা ভালবাসে
কেনই বা সে আসে।

—:০:—

ভ্রম সংশোধন

ভাবমুখে, বৈশাখ, ১৩১০ সংখ্যার ২১ পাতায় শ্রীসমরেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌ মহাশয়ের "অঘটন ঘটনের অলৌকিক রহস্য—উদ্ভ্রান্তের দীক্ষা" প্রবন্ধের ৯নং প্যারার দ্বিতীয় লাইনে "শক্তি সাধনায় সিদ্ধ হন কেন?" স্থলে হবে "……সিদ্ধ হন কেন?" এবং ঐ পাতার দ্বিতীয় স্তম্ভের নীচে থেকে ৭ম লাইনে "আত্মসমর্পণকারী অধ্যক্ষ……গ্রহণ করবেন।" ইত্যাদি বাক্যটি হবে "আত্মসমর্পণকারী অধ্যাত্মসাধন কর্মীর এতদ্বিষয়ক সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন দীক্ষাগ্রহণান্তে গুরু স্বয়ং।"

শুভঙ্করী আঁকে যাঁর ধাঁধা লাগতো (২৭)

মানিকবনের প্রিয় সাথীরা,

শ্রীসত্যানন্দ প্রীতি শুভেচ্ছা তোমরা সকলে নিও। তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে, আমরা গদাধরের শিবরাত্রির লীলাকথা শুনছি। গদাধর শিবরাত্রির উপোস ক'রে নিজের বাড়ীতে বসেই দেবাদিদেব মহাদেবের পূজো করতেন নিষ্ঠা ভরে। শিবের পূজো তোমরা হয়ত জান, প্রহরে প্রহরে করতে হয়। প্রথম প্রহরের পূজো শেষ ক'রে গদাধর শিবের ভাবে তন্ময় হয়ে বসে আছেন। এমন সময় তাঁর সমবয়সী কয়েকজন বন্ধু ছুটে এসে তাঁকে জানাল—"ভাই গদাই, পাইনদের বাড়ীতে আজ শিবের যে যাত্রা হবে তাতে তোমাকে শিব সাজতে হবে। যাত্রাদলের যে লোকটি শিব সাজবে হঠাৎ সে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় আজ সে শিবের অভিনয় করতে পারবে না। যাত্রাদলের অধিকারী অন্য কোন উপযুক্ত লোক খুঁজে না পেয়ে আজকের মত যাত্রা বন্ধ রাখতে অনুরোধ জানিয়েছেন পাইন কর্তার কাছে। তখন গ্রামের বৃদ্ধরা পরামর্শ ক'রে অধিকারীকে বিশেষ ক'রে পাঠাল, লোক জোগাড় ক'রে দিলে তিনি আজকের মত যাত্রা চালিয়ে দিতে পারবেন কিনা। এ প্রস্তাবে অধিকারী রাজী হয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, শিব সাজার লোক পেলে তিনি তাকে দিয়েই যেমন ক'রে হ'ক চালিয়ে নেবেন। এখন ব্যাপার হল কি, গাঁয়ের লোকদের, ভাই, তোমার কথাই বিশেষ ক'রে মনে পড়েছে। কারণ, তুমি শিবের গান জান। তোমার কি মিষ্টি গলা। অভিনয়ও করতে পার ভাল। শিব সাজলে তোমাকে খুব সুন্দর মানাবে। তাই তাঁরা তোমাকেই চাইছেন। আমাদেরও খুব ইচ্ছা যে, তুমিই ক'র। তুমি শিবের অভিনয় করলে খুব চমৎকার হবে। তুমি এক্ষুনি চল। সবাই বলে আছে।"

গদাই বিধিবৎ নিষ্ঠার সঙ্গে পূজো করছেন আজ। মাত্র এক প্রহরের পূজো শেষ হয়েছে তাঁর। শিবের ভাবে ডুবে রয়েছেন। এ অবস্থায় কোথাও গেলে পূজোটা তো পণ্ড হবেই, শিবের যে এমন চমৎকার ভাব এসেছে সেটাও যাবে ছুটে। একথা ভেবে তিনি বন্ধুদের কথায় শিব পূজো ছেড়ে যাত্রার শিব সাজতে যেতে কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না। তাদের বললেন তিনি সেকথা। গদাইয়ের আপত্তির কারণ শুনে তারা বলল—"ভাই গদাই, এতে তো তোমার শিবের ভাব নষ্ট হবার বা পূজো পণ্ড হবার কোন কারণ দেখছি না আমরা। বরং শিব সাজলে তো সর্বক্ষণ শিবের ভাব, শিবের ধ্যান, শিবের চিন্তা নিয়েই থাকতে হবে, আর সে-ভাবে শিবের স্মরণ মনন নিয়ে থাকাটা পূজোর চেয়ে কম কিসের ভাই। তাছাড়া আর একটা কথা তোমাকে ভাল ক'রে ভেবে দেখতে বলি। দেখ, গাঁয়ের কত লোক শিবরাত্রির ব্রত পালন করবে বলে উপোস ক'রে রয়েছে। যাত্রা দেখে আনন্দও পাবে আবার রাত জাগার ব্রত পালনেরও সুবিধে হবে। সেই জন্যেই তো শিবরাত্রিতে এই যাত্রার ব্যবস্থা। যাত্রাটা না হ'লে তাদের মনে কত কষ্ট হবে ভেবে দেখ।"

ব্যস, আর বেশী বলতে হ'ল না। বন্ধুদের এই শেষ অস্ত্রটি গদাইয়ের সনিষ্ঠ শিব পূজোর সঙ্কল্প অটল মনকে টলিয়ে দিল। তিনি যে দুঃখহারী নারায়ণ। এতগুলো লোকের মনঃকষ্টের কাছে তাঁর নিজের পূজো কি কখন বড় হতে পারে? তাই "তাদের মনে কত কষ্ট হবে" বন্ধুদের মুখে একথা শোনা মাত্র গদাই রাজী হলেন যাত্রাদলের শিবের ভূমিকায় নামতে।

গদাই সবাদের সঙ্গে চলে এলেন যাত্রার আসরে। তাঁর "সেজাজ" গদাবিষ্ণু ও গদাই শিব সাজবে ভেবে বলরাম নিয়ে ছুটে এসেছেন। গদাবিষ্ণুর পরিচয় তোমাদের আগের চিঠিতে দিয়েছি। গদাবিষ্ণুও অভিনয় করতে পারেন। অভিনয়ে যে যে-ভূমিকায় নামবে তাকে সেইরকম সাজিয়ে দিতেও পারেন। তাই ছুটে এসেছেন "সেজাজ"কে নিজের হাতে ভাল ক'রে শিব সাজিয়ে দেবেন ব'লে। গদাবিষ্ণু তাঁর সেজাজকে সাজঘরে নিয়ে গিয়ে শিবের বেশে সাজিয়ে দিলেন। গদাই শিব সেজে সাজ ঘরে বসে আছেন। বসে বসে শিবের কথাই ভাবছেন, এমন সময় তাঁর ডাক পড়ল। বন্ধুদের একজন তাঁকে পথ দেখিয়ে সঙ্গে ক'রে আসরের দিকে নিয়ে যাবার জন্য এগিয়ে এল। সখার ডাকে গদাই উঠে চলতে সুরু করলেন। চলছেন, কিন্তু কেমন একটা আবছা ভাব। কোন দিকে লক্ষ্য নেই। ধীর মন্থর গতিতে আসরে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। শিবের বেশে ঠাকুরের সে কি অপরূপ দিব্য রূপ। মাথায় রুক্ষবর্ণ জটাভার রূপে লম্বা হয়ে দুলছে দু'কাঁধের পাশ বেয়ে। ভস্ম মাখা দেহযষ্টি দিয়ে বয়ছে স্নিগ্ধ জ্যোতি। এক হাতে শিঙা, আর এক হাতে ত্রিশূল। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কণ্ঠ ও বাহুকে বেষ্টন ক'রে মাথার ওপর ফণা তুলছে অনন্ত নাগ। পরণে বাঘছাল, মন অন্তর্মুখী। চোখের পাতা পড়ছে না। অপলক দৃষ্টি, ঠোঁটের কোনে দিব্য স্নিগ্ধ হাসির রেখা। শিবের আবেশ-মত্ত শ্রীঅঙ্গ। কি অপূর্ব শিবমূর্তি। কে বলবে অভিনয়ের নকল শিব। এ যে জাগ্রত সকল সচ্চিদানন্দ শিব। শিবসুন্দর কৈলাসপতি স্বয়ং আবির্ভূত আজ এই শিবরাত্রির মহালগ্নে। "দর্শকরা দেখে তাঁরে কহে গদাধর। / আপন কৈলাস ছাড়ি কৈলাস ঈশ্বর"।[১] গদাইকে এমন জীবন্ত জাগ্রত শিবের রূপে দেখে আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল দর্শকমণ্ডলী। পুরুষেরা উচ্চস্বরে হরিধ্বনি দিতে সুরু করল। মায়েরা হুঠাৎ উলু দিয়ে উঠল, শাঁখ বাজাতে লাগল। "শুভ্রবতী পুরনারী সবে করে হুলুরব / গগনে ভুবনে জেগে ওঠে যেন নব উৎসব। / জয় শিব রবে মুখরিয়া ওঠে যাত্রা আসর / কাঞ্চনী বাজে, পুষ্প বাদল ঝরে ঝর ঝর,"।[২] গাঁয়ের পুরুষ ও মায়েদের মধ্যে গুটিকয়েক ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী গদাইকে শিশুকাল থেকেই চিনেছিলেন দেবশিশু বলে। তাঁরা গদাইয়ের এমন অপরূপ শিবরূপ দর্শন ক'রে তাঁকে সাক্ষাৎ শিবজ্ঞানে জানালেন সশ্রদ্ধ প্রণাম। এঁদের মধ্যে ছিনু পাঁচারীর ছিল বিশেষ চেনার চোখ। তিনি যেন বুঝতে পেরেছিলেন, গদাধর রূপে ভগবানের মহা আবির্ভাব হয়েছে জগতে। বহু লীলা হবে এঁর। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। গদাইয়ের লীলা সব দেখতে পাবে না এই তাঁর দুঃখ। গদাইকে ঠাকুর ভালবাসেন। সাক্ষাৎ গোপাল রূপে দেখেন তাঁকে। এঁর কথা পরে তোমাদের বিস্তারিত বলব। এমন যাত্রার দর্শকের ভিড়ে বসে গদাইয়ের এমন জীবন্ত শিবরূপ দর্শন করে ভক্ত ছিনু আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি চারটি বেলপাতা যোগাড় ক'রে তাঁর চরণে অঞ্জলি দিয়ে জীবন্ত ছিনুর শিবের পূজো করলেন পরম অনুরাগে। তাঁর সঙ্গে গাঁয়ের আরও কয়েকজনও যোগ দিলেন। "ছিনে আদি ছিনু আদি গ্রামবাসিগণ। / তাড়াতাড়ি বিল্বপত্র করিয়া চয়ন। / চরণে অর্পণ করে মহা অনুরাগে। / মহেশ-সন্তোষ দিবা নৈবেদ্য-সংযোগে।"[১] যাত্রার আসরে শিববেশে গদাইকে এমন অপরূপ রূপে দর্শন ক'রে দর্শকদের মধ্যে চারিদিকে ক্রমশঃ একটা আনন্দের সোরগোল প'ড়ে গেল। যাত্রাদলের অধিকারী ভেবলেন এরকম চলতে থাকলে তো যাত্রাটাই মেঠে মাটি হবে। দর্শকদের শান্ত করবার জন্য তিনি চড়া সুরে শিবের স্তুতি আরম্ভ করলেন। এতে শ্রোতারা খানিকটা শান্ত হলেও গদাইকে নিয়ে তাদের মধ্যে চাপা গলায় নানা রকম কথা বলাবলি থামান গেল না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরস্পরকে ইশারা ক'রে বা ঠেলাঠেলি ক'রে বলতে লাগল

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—অক্ষয় কুমার সেন

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্য—শ্রীঅর্জুনাপুরী

"বাঃ বাঃ গদাইকে কি সুন্দর সাজিয়েছে, বল্।" কেউ বলছে, "সত্যি, ছেলেটা শিবের পার্ট যে এত ভাল করবে আমরা কেউ ভাবিনি।" কেউ বলছে, "ওকে বাদিয়ে নিয়ে আমাদের একটা যাত্রার দল গড়লে বেশ হয়।" শ্রোতারা গদাইয়ের এত সুন্দর শিবের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে সানন্দে নিজেদের মধ্যে এইরকম নানা আলাপালি করছে। ওদিকে গদাধর তখনও কিন্তু সেই একই ভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর তখন দু'চোখ বেয়ে অবিরল ধারায় ঝরে চলেছে চোখের জল। চোখের জলে বুক ভিজে যাচ্ছে কিছুক্ষণ এইভাবে কাটার পরও গদাই কোন কথা বলছেন না, নড়াচড়া কিছু করছেন না, একই জায়গায় স্থানুর মত দাঁড়িয়ে আছেন দেখে অধিকারী ও গাঁয়ের দু'একজন বৃদ্ধ ছুটে গেলেন গদাইয়ের কাছে। তাঁরা কাছে এসে দেখেন গদাইয়ের হাত পা অসাড়। একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য।

গদাই বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে একথা যখন শ্রোতাদের মধ্যে চাউর হয়ে গেল, তখন আসরে চারিদিকে দারুণ হৈচৈপাল শুরু হয়ে গেল। আসরের নানা দিক থেকে লোকের মুখে নানারকম ব্যস্ত-ব্যাকুল নির্দেশনা শোনা গেল। কেউ বলছে, গদাই ভিরমি গেছে,শিগ্‌গির জল আন, চোখে মুখে জল দাও। কেউ বলছে, হাওয়া কর, হাওয়া কর, ভিড় ক'রো না, হাওয়া আসতে দাও। আবার গদাইয়ের অধ্যাত্মভাব প্রবণ মনের ব্যাপারটা যারা জানত, বিশ্বাস করত, তারা চিৎকার করে বলতে লাগল, ওরে, এ আর কিছু নয়, গদাইয়ের শিবের ভর হয়েছে, শিবের আবেশ হয়েছে। শিবের নাম শোনাও, শিবের নাম কর। আর যারা নিছক যাত্রা শোনার আনন্দ লুটতে এসেছিল তারা যাত্রাটা এ ভাবে পণ্ড হয়ে যেতে দেখে খুবই বিরক্তির সঙ্গে আপসোস করে বলে উঠল, "আরে ধুর, ছেলেটা যেমনি রস শুরু করল, এমন সুন্দর পালাটা শুনতে দিলে না।

যাইহক, গদাইয়ের সেবা-শুশ্রূষা করতে অনেকেই ছুটে এল। সঙ্গে সঙ্গে জল এল। চোখে মুখে ছিটান হ'ল। বাতাস করা হ'ল। নামও করা হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। হবে কি ক'রে? গদাধর যে এখন শিবময়। শিবের ভাবে ভাবসমাধিতে ডুবে আছেন। তাই হঠ ক'রে বাহ্যজগতে মন নামতে চাইবে না। কাজেই গদাইয়ের জ্ঞান ফিরছে না দেখে যাত্রার এখানেই ইতি হয়ে গেল। যাত্রা ভেঙে গেল। গদাইকে কয়েকজনে মিলে ধরাধরি করে কাঁধে চাপিয়ে বাড়ী নিয়ে গেল। মা চন্দ্রাদেবীর কাছে পৌঁছে দিল। গদাইকে ঐ রকম অসহায় অবস্থায় দেখে বাড়ীতে রীতিমত হাহাকার পড়ে গেল। আর গদাইয়ের মার যে কি অবস্থা হ'ল সে তো বুঝতেই পারছ। চন্দ্রামণি চন্দ্রাদেবীর নয়নমণি। তাকে ছেড়ে চন্দ্রা মা বেশীক্ষণ স্থির থাকতে পারেন না। গদাই বেশীক্ষণ তাঁর চোখের আড়াল হলে তাঁর মনে আসে নানা আশঙ্কা, উদ্বেগ। শিবপূজো ছেড়ে উপবাসী গদাই ঐ ভাবে আজ যাত্রা করতে যাবার সময় থেকেই চন্দ্রামণির মন গদাইয়ের জন্য খুবই শঙ্কিত ছিল। মায়ের মন যায় সমাধি তখন অত বোঝে না। গদাইকে এইরকম সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেয়ে গদাইয়ের কি হল এই ভয়ে ভাবনায় আতঙ্কে তিনি গদাইকে কোলে তুলে নিয়ে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

"বোঝে নাকো ধ্যান বোঝে না সমাধি মায়ের পরাণ / চেয়ে চেয়ে কাঁদে কখন যাদুরে মেলিবি নয়ান।"[৭] বহু চেষ্টাতেও গদাইয়ের মন বাহ্য জগতে ফিরছিল না। তিন রাত গদাই ঐ ভাবে শিবের ভাবে সমাধিস্থ ছিলেন। তিনদিন পর ভোরের আলোয় গদাই চোখ মেললেন। চন্দ্রামার মুখেও ফুটে উঠল পরম স্বস্তির হাসি। "তিনটী তিমিরা রজনীর শেষে ভাতিল সে ধ্যান, / চন্দ্রার চোখে কাল রাত্রির হ'ল অবসান।"[৮] শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী তাঁর "শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে" এই ঘটনাকেই বলেছেন গদাধরের তৃতীয় ভাব সমাধি। গদাধর-শিবসুন্দরের চরণে আমাদের প্রণাম জানিয়ে এবারের চিঠির ইতি টানছি। তোমাদের

বড় মামা

অঘটন ঘটনের অলৌকিক রহস্য—উড্‌রফের দীক্ষা

শ্রীসমরেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১০। উড্‌রফের ভ্যাভাক ষ্ট্রীট ভবনে ভারতীয় দর্শন, অধ্যাত্মতত্ত্ব, ভারতীয় শিল্পকলা ও ভাস্কর্য্য বিষয়ে গুরু শিবচন্দ্রের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা।

কাশী হইতে কুমারস্বামি (বড়গ্রাম) যাইবার পথে গুরু শিবচন্দ্র উড্‌রফের ভ্যাভাক ষ্ট্রীট ভবনে প্রায় মাসাধিককাল বাস করিতেন বছরে চার পাঁচ বার। সেই সময় উড্‌রফ একটি আলোচনা সভা তাঁহার বাড়ীতে ডাকিতেন, গুরু শিবচন্দ্রের সভাপতিত্বে। আলোচনা হইত সংস্কৃত ভাষায়। হরিদেব শিবচন্দ্রের ভাষণ সংস্কৃতে লিখিয়া উড্‌রফকে দিতেন, উড্‌রফ তৎক্ষণাৎ ইংরাজিতে ভাষান্তরিত করিয়া বলিতেন ও পরে ইংরাজী অনুবাদ টাইপ করিয়া প্রয়োজন মত সভ্যসদ্যদের বিতরণ করিতেন। বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র, পুরাণ আদি ভারতীয় ও বৌদ্ধ শিল্পকলা ও ভাস্কর্য্য বিষয়ে বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা হইত। সেই সভায় প্রখ্যাত বৌদ্ধ শিল্পী ও সমালোচক আনন্দকুমার স্বামী, ই, বি, হ্যাভেল, অবনীন্দ্রনাথ, ও অন্যান্য শিল্পী, অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, আচার্য ব্রজলাল শাস্ত্রী, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, অটল বিহারী ঘোষ, ডক্টর কালিদাস (অধ্যাপক) ও আরও বিশিষ্ট শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন। আচার্য রামানন্দ বসাক ও রায়বাহাদুর অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় সুযোগ পাইলে বিশেষ কোন অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতেন। উড্‌রফ কোন কোন সভায় তাঁহার ও তাঁহার সহকারী রচয়িতাদের সংস্কৃত হইতে ইংরাজীতে অনূদিত কোন তন্ত্রগ্রন্থ লইয়াও গুরুর অভিমত জানিবার জন্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা উত্থাপন করিতেন। কুমারস্বামী ও' গুরু শিবচন্দ্রের দ্বারা হিন্দুধর্মে দীক্ষান্তরিত হ'ন ও তন্ত্র দীক্ষা ও সাধনা পান। হ্যাভেল এতদূর হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া উঠেন যে, আর্টস্কুলের দেবদেবীর প্রস্তর মূর্তি সভাগৃহের কক্ষ দিয়া যাইবার সময় হঠাৎ মাটিতে বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়া পড়িতেন। তাঁহার অর্দালীরা জোর করিয়া তাঁহার ধ্যান ভাঙাইয়া তাঁহাকে অফিসে চেয়ারে বসাইয়া দিত। শিবচন্দ্রের বর্ণিত ভারতীয় শিল্পকলা, ভাস্কর্য, বৌদ্ধ শিল্পকলা ও ভাস্কর্য বিষয়ক শাস্ত্রোক্ত বিধি, শিল্পকলা শৈলী ও তাহার সমালোচনা কুমার স্বামী, হ্যাভেল, অবনীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য শিল্পীদের দৃষ্টিপথে নতুন আলো আনিয়া দিত।

এলেনার ও উড্‌রফ, অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও ব্রজলাল শাস্ত্রী এই কয়জনের সংস্কৃত সহযোগিতায় বাংলা ও তিব্বতী ভাষা হইতে উড্‌রফ ইংরাজিতে তন্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী রচনা করিতেন। বেশীর ভাগ রচনা উড্‌রফই করিতেন ও তাঁহার রচিত গ্রন্থে তাঁহার সহকর্মীদের রচিত অংশ তাঁহাদের নাম উল্লেখে মূলগ্রন্থে সন্নিবেশিত করিতেন। উড্‌রফ ও প্রমথনাথ রচনা করেন মহামায়া গ্রন্থ ও উড্‌রফও অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় রচনা করেন প্রপঞ্চতন্ত্র সারতন্ত্রম্ শঙ্করাচার্যকৃত। Tantric Texts উড্‌রফ সপত্নি রচনা করেন। কোন তিব্বতী ভাষার মূলগ্রন্থ নাথা বা চৈনিক ভাষায় মূলগ্রন্থ চীনা সাধকের রচিত তন্ত্রগ্রন্থ ইংরাজিতে সেই সেই পণ্ডিত সাধকের সহায়তায় অনুবাদ করিয়া স্বীয় রচিত গ্রন্থে তাহা সন্নিবেশিত করিতেন।

উড্‌রফ তন্ত্রশাস্ত্র বিষয়ে নানা সভায় ভারতে ও ইংলণ্ডে, ইংরাজিতে ভাষণ দিতেনও ফ্রান্স ও জার্মান দেশে ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষায় ভাষণ দিতেন। তাঁহার

উদ্যোগে ও প্রেরণায় ইংলণ্ডে, আমেরিকায় ফ্রান্সে ও জার্মানিতে কয়েকটি তান্ত্রিক সোসাইটি স্থাপিত হয় ও সেখানে তন্ত্রশাস্ত্র লইয়া পাঠ ও গবেষণা এখনও চলিতেছে।

১১। সংস্কৃত, হিব্রুভী ও বাংলা ভাষা হইতে ইংরাজিতে ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনীসহ উত্তরকের রচিত তন্ত্রগ্রন্থ সমূহ।

মহামহোপাধ্যায় আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ বলিতেছেন—"বর্তমান যুগে বিলুপ্ত প্রায় বৈদিক সাহিত্যের পুনরুদ্ধার বিষয়ক প্রাথমিক উদ্যম যেমন মোক্ষমূলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণ করিয়াছিলেন ঠিক সেই প্রকার বিলুপ্তপ্রায় তান্ত্রিক সাহিত্যের দিকেও সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরই দৃষ্টি আকর্ষণ হইয়াছিল। এই বিষয়ে তাঁর অন উত্তরক তরকে আর্থার এভালোনের কথা আমরা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না"।[১৭]

উত্তরকের খ্যাতি শুধু বিদ্যাত জজ ও আইন বিশারদ বলিয়া নহে, তিনি অধুনা যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের আমেরিকার সমক্ষ দুখী খ্যাতিলাভ করেন তন্ত্রশাস্ত্রের যুগোপযোগী একমাত্র প্রবক্তা বলিয়া। তিনি নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন নীরব ভাষায়, গভীর ভাব ও পাণ্ডিত্যে ও অন্যান্য সাধনায়।

তাঁহার একচল্লিশখানি তন্ত্রগ্রন্থ ইংরাজি, ফরাসী ও জার্মাণ ভাষায় মূল সংস্কৃত ভাষায় ও হিব্রুভী ও বাংলা ভাষা হইতে অনূদিত, টীকা, টিপ্পনী ও জ্ঞানগর্ভ ভাষ্য সম্বলিত। পাশ্চাত্য দেশে ফরাসী ও জার্মান ভাষায় অনূদিত গ্রন্থগুলি সেই দেশের প্রকাশকগণ প্রকাশ করেন। ইংরাজি ভাষায় অনূদিত গ্রন্থগুলি Ganesh & Co. Madras (Private) Ltd. প্রকাশ করেন। যে কয়টি ইংরাজি ভাষায় তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাহার পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল—

১। Mahamaya—মহামায়া, মুখবন্ধক উত্তরক ও অধ্যাপক প্রবথনাথ মুখোপাধ্যায়। এই বইখানি এখন কয়েক বৎসর বাজারে সময়মত পাওয়া যায় না।

২। Alleged Conflict of Sastras—তথাকথিত শাস্ত্র মধ্যে বৈষম্য—বাজারে পাওয়া যায় না।

৩। Creation as explained in Tantra—তন্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা। বাজারে পাওয়া যায় না।

৪। Garland of letters—বর্ণমালা বা মন্ত্রমালা।

৫। Introduction to Tantrisim—তন্ত্র পরিচিতি। তন্ত্রশাস্ত্রের বিশ্লেষণ। বাজারে পাওয়া যায় না।

৬। Power as life—প্রাণই শক্তি—বাজারে পাওয়া যায় না।

৭। The spirit of race—জাতির আত্মচেতনা। বাজারে পাওয়া যায় না।

৮। Sakti and Sakta—শক্তি ও শাক্ত। কখন কখন Oxford Book & Stationery সংস্থায় পাওয়া যায়।

৯। Sakti or World as power—বিশ্বই অনন্ত-বীর্য—বাজারে পাওয়া যায় না।

১০। The serpent Power—কুণ্ডলিনীশক্তি। তন্ত্রের লয় বা কুণ্ডলিনী যোগ পদ্ধতি ও তদ্বিষয়ে অপূর্ব জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা ও অনবদ্য ভাষায় টীকা ও টিপ্পনীসহ। মূল সংস্কৃত ষট্‌চক্র নিরূপণ ও পাদুকাপঞ্চক গ্রন্থাংশের ইংরাজী অনুবাদ। বইখানির মুখবন্ধ পড়িলে ইহার বিষয়বস্তু কুণ্ডলিনী বা লয়যোগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত জ্ঞান লাভ করা যায়।

১১। Hymns to Goddess—দেবী স্তোত্রাবলী। বাজারে পাওয়া যায় না।

১২। Principles of Tantra—শ্রীশিবচন্দ্রের তন্ত্রতত্ত্ব গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ। ইহাই উত্তরকের গুরুদক্ষিণার প্রথম অর্ঘ্য। বাজারে কদাচিৎ পাওয়া যায়।

১৩। The Greatness of Siva শিবমাহাত্ম্য। বাজারে পাওয়া যায় না।

১৪। Waves of Bliss—শঙ্করাচার্যের আনন্দ-লহরী। বাজারে পাওয়া যায় না।

১৭। তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত—১৬

১৫। কালীস্তোত্র—Hyme to Kali। বাজারে পাওয়া যায় না।

১৬। Kama kala Vilas—কামকলা বিলাস। বাজারে পাওয়া যায় না।

১৭। The Great Liberation—মহানির্বাণতন্ত্র। বাজারে পাওয়া যায় না। একশ আটচল্লিশ পাতা ঐ গ্রন্থের মূল বই। মূল গ্রন্থ ও ভাষ্য রাজা রামমোহন রায়ের গুরু হরিহরানন্দ তীর্থ স্বামীর রচিত। মূল পুঁথীখানি উড্রফ দেখিয়া বলেন যে, সমস্ত পুঁথীখানি রাজা রামমোহন রায়ের হাতের লেখা। ঐ বইটির মুখবন্ধখানি পড়িলে বলা যায় যে, উহা তন্ত্রশাস্ত্রের দিগ্‌দর্শন। গবেষ কোং বহুদিন বইখানি ছাপায় নাই।

১৮। কুলার্ণবতন্ত্র—Kularnabe Tantra। শাক্তাচার সম্বন্ধে আকরগ্রন্থ। বাজারে বইখানি পাওয়া সব সময় যায় না।

১৯। Tantric Texts—তন্ত্রগ্রন্থাদির মূল পাঠ, পনের খণ্ডে। এই গ্রন্থ উড্রফ ও এলেনার উড্রফ প্রচুর করেন। বাজারে পাওয়া যায় না।

২০। Kalivilas Tantra—কালীবিলাস তন্ত্র। শক্তিসাধনবিধি ও সাধন পদ্ধতি। বাজারে পাওয়া যায় না।

২১। শঙ্করাচার্যকৃত প্রপঞ্চসার তন্ত্রম্—Propanchasar Tantram। বাজারে পাওয়া যায় না। ১৯১৪ সালে সন্ধ্যাল প্রেস ছাপায়। বইখানি ১১৩ খণ্ডে। তিন খানি পাণ্ডুলিপি উড্রফ ও যতেন্দ্র বিদার্ট সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি রায়বাহাদুর অক্ষয় চন্দ্র মৈত্রেয়, সি, আই, ই, যোগাড় করেন। তাঁহারা দুজনে পাণ্ডুলিপি তিনটি মিলিয়ে বিদার্ট সোসাইটীর পাণ্ডুলিপি বেলীর ভাগ গ্রহণ করেন। ঐ দুই তন্ত্রজ্ঞ যোগীপুরুষ গ্রন্থখানির সহ-রচয়িতা। সংস্কৃত তিনটি পুঁথি হইতে পাঠ উদ্ধার করিয়া প্রথমে তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় ও দেবনাগরী হরফে বইখানি পূর্ণাঙ্গ করেন। প্রত্যেক অধ্যায়ের আরম্ভে ইংরাজিতে সেই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া টীকা টিপ্পনী ও ভাষ্য লিখেন। বইখানি দুই তন্ত্রবিশারদ যোগীর একটি বিস্ময়কর অপূর্ব অবদান। বৈদান্তিক শঙ্কর ছিলেন শাক্তাচারী তান্ত্রিক এটী ঐ বই হইতে জানা যায়। উড্রফ তাঁহার শক্তি ও শক্তিতত্ত্বে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন।

২২। Mysticism of Tantrikism—তন্ত্রে রহস্যবাদ উড্রফের টেগুর লাইব্রেরীতে ইংরাজি ভাষণ; লেকচারশীট সভ্যদের মধ্যে বিতরণ। বাজারে প্রকাশ হয়নি। টেগুরলাইব্রেরীতে ১৯৬১ সালে বইখানি দেখিয়াছি। ঐ সব বইগুলি ও ফরাসী ও জার্মাণ ভাষায় ২১খানি বই আমি ১৯৮০ সালে August September মাসে ইংলণ্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বডলীন লাইব্রেরীতে ও উড্রফের এলিসিয়ামস্থ (অকস্‌ফোর্ড সায়ার) বাসভবনের লাইব্রেরীতে সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত দেখিয়াছি। বহু ইংরাজি, ফরাসী ও জার্মাণ ভাষায় উড্রফকৃত ভাষণ পুস্তকাকারেও দেখিয়াছি।

অন্যান্য গ্রন্থ—

১। In India Civilized?—ভারত কি সভ্য দেশ?

২। Injunction—আদালতের নিষেধ আজ্ঞা।

৩। Receiver—সম্পত্তি আদি সংরক্ষণে আদালত নিযুক্ত রিসিভার বা অধি।

৪। Civil procedure—দেওয়ানী কার্যবিধি

৫। Evidence—সাক্ষ্য প্রমাণ বিষয়ক আইন ২ হইতে ৩ সংখ্যক গ্রন্থগুলি প্রচলনকালে আইনজ্ঞ সমাজে বহুল প্রচার ছিল ও বিশেষ নির্ভরযোগ্য ছিল। তিনিতার গ্রন্থটি আজও একটি Classic অত্যুত্তম রচনা বলিয়া আইনজ্ঞমহল স্বীকার করেন।

সুধীপাঠক জাতীয় গ্রন্থাগার ও এসিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থাগার খুঁজলে অতি সাধারণ সংখ্যক উড্রফের গ্রন্থগ্রন্থ পাইবেন। টেগুর লাইব্রেরীতে কয়েকটি বই দেখি।

(ক্রমশঃ)

আশ্রম-সংবাদ

খরাত্রাণে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ী

প্রধান মন্ত্রীর ত্রাণতহবিল থেকে পাওয়া ছিল লক্ষ টাকা নিয়ে আশ্রম কর্তৃপক্ষ যখন প্রথম পর্বের কাজ সমাধান ক'রেছেন অর্থাৎ দু'টি জেলার মোট ১৮টি কেন্দ্রে (বীরভূম—১৮টি কেন্দ্র এবং মুর্শিদাবাদ—৭টি কেন্দ্র) শীতার্ত দুঃস্থ নরনারায়ণদের মধ্যে কম্বল, ধুতি, শাড়ী, জামা-প্যান্ট ইত্যাদি পোষাক বিতরণ সমাপন করেছেন—ঠিক তার অব্যবহিত পরেই গ্রামে গঞ্জে অন্নক্লিষ্ট মানুষদের খাদ্যের জন্য আকুল হাহাকার বিচলিত ক'রে তুলল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সন্ন্যাসীগণকে ও তাঁদের অগণিত ভক্ত-শিষ্যদের। বীরভূমের সুসন্তান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায়—প্রধান মন্ত্রীর ত্রাণতহবিল থেকে যে পরিমাণ অর্থ আশ্রমকর্তৃপক্ষের হাতে এলো—প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই সামান্য। তবু যেটুকুই কাজ হয়েছে তার মধ্যে কোন প্রকার অব্যবস্থা বা অশান্তি হয় নাই।

প্রাপ্ত অর্থে—প্রথমপর্বে শীতবস্ত্রগুলি বিলি হয়েছে। বাকী অর্থে দ্বিতীয় পর্বে—দুঃস্থ নিরন্নদের মধ্যে রান্না করা খাদ্য বিলি দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। তাই, আশ্রম কর্তৃপক্ষ, এই কর্মযজ্ঞ সমাপন করতে অর্থ সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হলেন। স্থানীয় অধিবাসীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় এবং আশ্রমকর্তৃপক্ষ সংগৃহীত ৪০ হাজার টাকায় দ্বিতীয় পর্বের কাজ সমাপ্তির পথে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অকৃপণ করুণায়—গত মার্চ '৮০ থেকে সুরু ক'রে অদ্যাবধি দ্বিতীয় পর্বের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলছে। প্রতিদিন সকল কেন্দ্রেই রান্না করা খাদ্য দরিদ্রনারায়ণদের মধ্যে বিলি করা হচ্ছে। বিভিন্ন কেন্দ্রের পরিচালক মণ্ডলীর নিকট হ'তে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যাচ্ছে প্রত্যহ, প্রতিটি কেন্দ্রেই—৫০০ জন হ'তে ১০০০ জন পর্যন্ত নরনারায়ণ রান্না করা খাদ্য গ্রহণ করছেন।

বীরভূম জেলার মোট ১৮টি কেন্দ্রের মধ্যে ৬টি কেন্দ্রের কাজ অব্যাহত চলছে এবং ৩টি কেন্দ্রের কাজ কয়েকদিন আগেই সমাপ্ত হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ৭টি কেন্দ্রের কাজ ইতিপূর্বে সমাপ্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্বে এ পর্যন্ত মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২,৫৪,৭৭২'৪০ পঃ (দু'লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার সাতশো বাহাত্তর টাকা চল্লিশ পয়সা)।

—:০:—

"কায়মনোবাক্যে 'জগদ্ধিতায়' হতে হবে পড়েছ 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব' আমি বলি 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'—দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞান, দুঃস্থ ইহারাই তোমার দেবতা হউক ; ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।" —স্বামী বিবেকানন্দ

Bengal Down The Ages

Prof. Kausambi Nath Mallik

[*Continued from the previous issue*]

Matangini Hazra : During the August revolution in 1942, Midanapore set a unique example of sacrifice and Patriotism. Matangini Hazra was a daughter of this land, Born in a poor family, she was widowed at her early age of 12. She was a faithful follower of Gandhiji's ideal of non violence. On the eye of the August revolution Gandhiji gave the call 'Do or Die'. This moved the nation, Matangini was no exception. On the 29th August, 1942 early in the morning thousands assembled at Tamluk, a sub-division town of Midnapore. Police fired to disperse them. Some died, Old Matangini was also there. She took a congress flag shouted Vande Mataram' and went forward to break the police cordon. Others followed her. Her fiery words enchanted all others. The police shot at her She was hit on her hand. The old lady held the flag aloft with the other hand. The next shot hit the other hand. Still she continued her steps. Then a shot went through her head. She dr$\frac{o}{o}$ped. Imagine till her last breath she was holding the flag she loved, go to Tamluk and you will feel the cool breeze across a small tank flowing towards the statue founded at the spot where old Matangini shed her blood.

Netaji and his Azad Hind Fauz : When the Second World war started, the British Government kept strict watch on and Subhaschandra. In 1940 he was arrested and sent to jail. When his health broke down in jail he was released and kept interned in his house. By then there was war at the eastern side of India. Subhas Chandra fled the country in disguise and reached Germany via Kabul. There he was received cordially, He organised an army with the Indian soldiers of the British Army taken prisoner in African war. This in fact was the first step towards the Azad Hind Fauz. Subhas was then called 'Netaji'. By this time the Indians of Malay Singapore Burma and other South East Asian countries planned to fight the British. The famous revolutionary leader Rashbehari Bose was then in Japen. He founded the 'Indian Freedom League' and invited Netaji to lead it. Netaji reached Tokyo by a Submarine. From there he began to broad cast over the radio his plans to free India. In August he was made the Supreme Commander of the Azad Hind Fauz. Netaji then declared the formation of the Azad Hind government. As the Supreme Commander he set a unique example of unity, faith and sacrifice. In 1944 the disciplined and trained Azad Hind Fauz took the battle field with the battle-cry 'On to Delhi' (Chalo Delhi) Netaji said to his men "give me blood. I promise you freedom." His men song "This life is meant for the nation, for the nation it shall be laid down." The Azad Hind Fauz or the I.N.A. had not sufficient arms and food. But still they had love for the country

and they could reach upto Kohima in Manipur and hoisted the National Flag on the Indian soil. But that was all. It could not proceed further. Soon the war ended. The men of the I.N.A. was taken prisoner. But when the British government later wanted to try them in court, the whole country again shouted in protest. They were released. This armed revolt of the Azad Hind Fauz made the British government realise that it would not be possible for them to keep India under their feet any longer. In fact India was soon free. The name of Azad Hind Fauz of Netaji will ever be written in letters of gold in the history of the freedom movement in India.

[*To be continued*]

—:•:—

Raama Anaasakthi Yoga—The Universal Scripture

V. Ganesh Rav

Sons and daughters ! beloved of the soil,
Remember, years to realize the Father !
Each one has a share, tiniest through, and
Every act of Thine Counts and promotes, in
Making the earth the Kingdom of Heaven ;
All being pervaded and governed by
Omnipotence.
Do abide by His teaching in perfect reverence.
Be thou God minded aye, devotee !
Help the needy and boast not,
Avoiding lustful thoughts, be celibate.
Giving up greed, be contended,
Abolishing anger and hate by love pure,
Vanquish thy vanity by humility !
Abanddoning desires to Peace attune
Driven not by transience mundane,
Go thy path of Truth by Ahimsa !
Engage in work always thyself
Every act of thine be a sacrifice,
Think not the fruit thereof
Having faith in Me profound ! So
Attainst Me thou in Eternal Bliss.

—to:—

"Hapiness comes in the state of perfect freedom, and not in slavery ; that freedom again can be acquired only through the practice of self-control."

– Swami Abhedananda

'SAFEX' LAMINATED SAFETY GLASS
TOUGHENED GLASS
"TWINBIRD" MIRRORS ETC.

Manufactured by

Hindusthan Safety Glass Works Private Ltd.

2, ST. GEORGE GATE ROAD, HASTINGS,
CALCUTTA-22.

Gram : "DEVGLASS" PHONE : 45-0125 (3 Lines)

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের পুস্তকাবলীর কয়েকটী

যুগে যুগে যার আসা—(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবজীবনের ও সাধনমার্গের এক অপূর্ব জীবনালেখ্য) টা. ১২·০০

যুগাচার্য— (শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের জীবনবেদ অবলম্বনে জীবনী গ্রন্থ) টা. ৬·০০

বেদছন্দা— (শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের অমৃতবাণী সঙ্কলন—৫ খণ্ড একত্রে) টা. ৭·০০

কথামৃত-কথা — (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের কিছু বাণীর আধুনিক যুগসম্মত ব্যাখ্যা) টা. ৮·০০

জপ-ধ্যান— (জপ ও ধ্যানমার্গে অধ্যাত্মসাধনার সহজ নির্দ্দেশ) টা. ৬·০০

Complete Works— (In Eigth Volumes) Rs. 150·00

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২, পি. কে. সাহা লেন,
কলিকাতা-৭০০০৩৬ ফোন ৫২-৭১৩০

Regd. No. WB/NC-34 * BHABMUKHEY * *Phone : 52-7133*

With Best Compliments Of

Gram : COKEOVEN, CALCUTTA
Telephone : 24-4492, 24-5980

17 JUN 1383

INDIA POTTERIES LTD.

Manufacturers of :

Electrical Insulators upto 33 kv range as per I. S. Specification

And

Quality Tableware, 'India' Water Filter, Filter Candles, Figures, Dolls, Toys, Industrial Ceramics Etc. Etc.

Factory :
8, Nilgunj Road, Belgharia,
Calcutta-700056
Phone: 58-1198

Office :
91, Dharmatala Street,
Calcutta-700013

প্রচ্ছদপট পরিচিতি :—হুবরাজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের নবনির্মিত মন্দির

পত্রিকা সচিব—স্বামী পরমানন্দ। সম্পাদক—স্বামী অক্ষয়ানন্দ ও স্বামী শীলানন্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬ হইতে প্রকাশিত ও আশুতোষ প্রেস, মহাজিনন মঠ, কলিকাতা-৩৯ হইতে মুদ্রিত (ফোন : ৫২-৩১৭৯)। মুদ্রাকর ও প্রকাশক—স্বামী পরমানন্দ।

প্রতি সংখ্যা : এক টাকা পঁচিশ পয়সা মাত্র। বার্ষিক মূল্য : চৌদ্দ টাকা মাত্র।

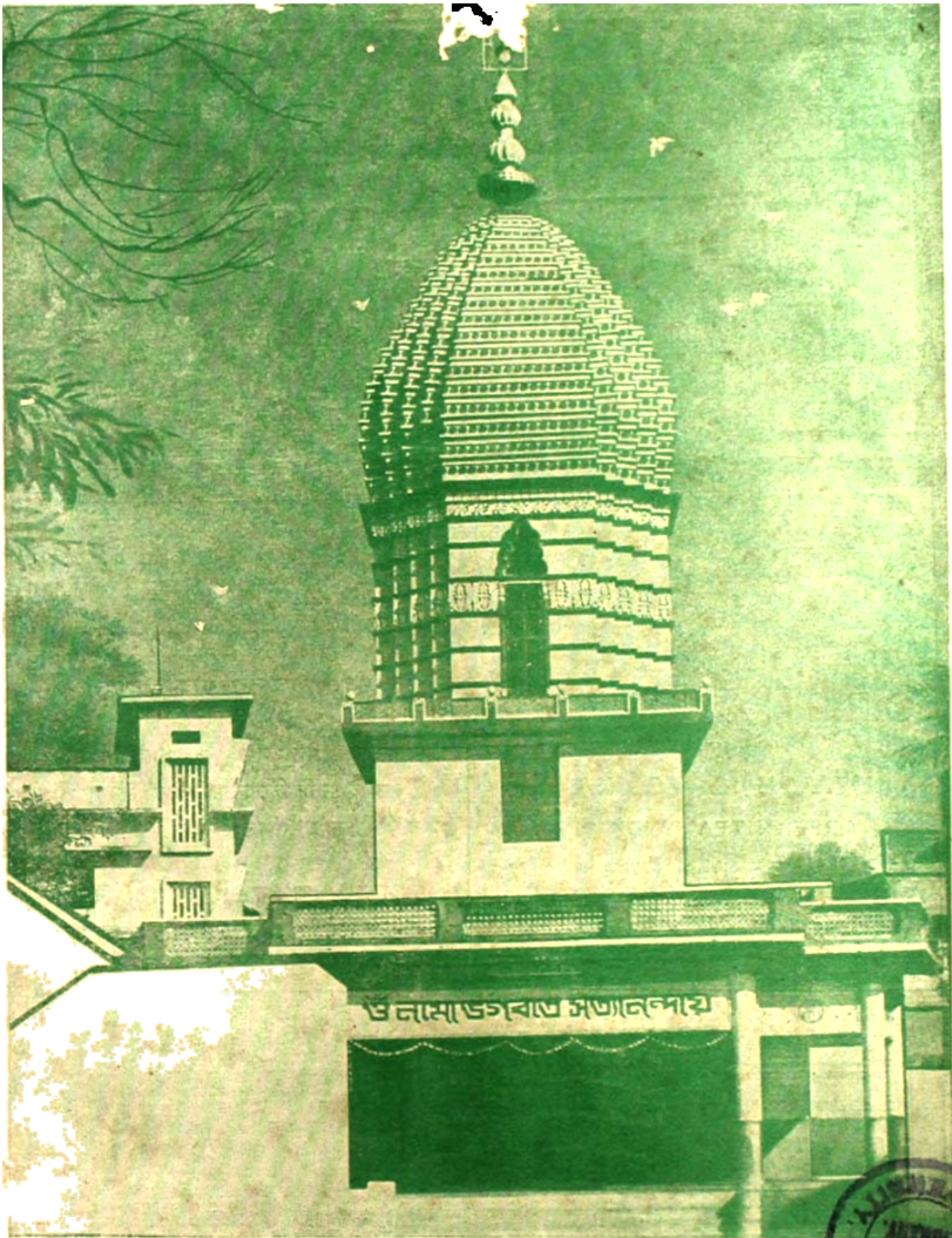

ভাবমুখে

আষাঢ় ● তেরশ' নব্বই ● সপ্তত্রিংশ বর্ষ

শ্রীরামপুর ও শাখাশ্রম, সি ডী

ভারতের মোটর পার্টস্ ব্যবসায়ে
একটি ঐতিহ্যপূর্ণ বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
হাওড়া মোটর কোম্পানী
– লিমিটেড –

রেজিষ্টার্ড অফিস—১৬৫, শরৎ বোস রোড
কলিকাতা - ২৬
প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্র নাথ মুখার্জি রোড
কলিকাতা - ১
অন্যান্য শাখা—দিল্লী ✤ কটক ✤ ধানবাদ ✤ পাটনা ✤ শিলিগুড়ি ✤ গৌহাটী

DRINK
ORPHAN'S TEA
For
HEALTH & ECONOMY
ORPHAN TEA SYNDICATE
133 Cornwallis St., Shyambazar
Phone : 55-2704

ফোন : ৫৫-৭২৫৮
এন্, কে, স্পোর্টস্
৬৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯
যাবতীয় খেলাধূলার সরঞ্জাম এবং কাপ শীলড ইত্যাদি বিক্রেতা বিভিন্ন ক্রীড়ামোদী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান।
✲
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত বিদ্যাপীঠ সমূহের যাবতীয় প্রয়োজনীয় খেলাধূলার সরঞ্জাম আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

"মানুষের মাঝে মানুষ রতন আছে"—শ্রীশ্রীঠাকুর

D. RATAN & Co.
Photographers PHOTO
22-1, CORNWALLIS ST. CAL 6
PHONE : 34 - 5711

ডি. রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফোন ৩৪-৩৪১১
ফটো
২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি-৬

আষাঢ়
তৃতীয় সংখ্যা

সপ্তত্রিংশ বর্ষ
তেরশ' নব্বই

তোমায় নমি বারবার	৬৩	শ্রীশ্রীঠাকুর
সম্পাদকীয় নিবেদন	৬৬	
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্য	৬৯	শ্রীঅর্চনাপুরী
বিজ্ঞানী ঠাকুর সত্যানন্দ	৮৮	সাধনাপুরী
আমার আত্মকথা	৭৩	সরলাপুরী
কথামৃত-কথায় সত্যানন্দ সঙ্গীত—২	৭৫	স্বামী যোগানন্দ
অঘটন ঘটনের অলৌকিক রহস্য —উত্তরকের দীক্ষা	৭৬	শ্রীসমরেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌ
সত্যানন্দ তীর্থের সন্ধানে	৭৮	অরুণা মুখোপাধ্যায়
ভুল করেছি	৮১	শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী
শ্রীগুরুসেবাদিষয়কলঘাসনম্	৮২	স্বামী সচ্চিদেকাত্মানন্দ

'ভাবমুখের নিয়মাবলী'

ভাবমুখে সিউড়ী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের মুখপত্র

বর্ষারম্ভ বৈশাখ মাস। বর্ষের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়, কিন্তু কমপক্ষে ৬ মাসের গ্রাহক হইলে সুবিধাজনক হয়। বার্ষিক চাঁদা বছরের প্রথমেই অগ্রিম দিতে হইবে।

বার্ষিক মূল্য সডাক টাঃ ১৪'০০। ষান্মাসিক টাঃ ৭'০০। (বাংলা ১৩১০ সাল হইতে)

রচনা : ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশ হইয়া থাকে। প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠান প্রয়োজন। ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। কোন রচনা প্রকাশ করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপেক্ষ। সমালোচনার প্রয়োজন হইলে দুই কপি করিয়া পুস্তক প্রেরণ করা আবশ্যক।

বিজ্ঞাপন : বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পূর্বমাসের মধ্যে পাঠাইলে উহা পরবর্তী মাসে প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জানিতে পারিবেন।

বিঃ দ্রঃ গ্রাহক গ্রাহিকাগণের প্রতি নিবেদন এই যে, পত্রিকা উপযুক্ত সময়ে না পাইলে সর্বপ্রথম স্থানীয় ডাকঘরে সন্ধান লইবেন এবং পরে অফিসে জানাইবেন। পত্রাদি লিখিবার সময় গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করিবেন।

কোন গ্রাহক-গ্রাহিকা ঠিকানা পরিবর্তন করিলে উহা পূর্ববর্তী মাসের ৩ তারিখের মধ্যে কার্যালয়ে জানান আবশ্যক।

বার্ষিক চাঁদা বৈশাখ মাসের মধ্যে মণিঅর্ডার যোগে, গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা মণিঅর্ডার ফর্মের নির্দিষ্ট মূলে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া "স্বামী পরমানন্দ, ভাবমুখে সচিব, ২, সি. কে. সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬" (ফোন : ৫২-৭১৩৩) এই ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, সকল রকম শীতের পোষাক, বেনারসী, সিল্ক, তাঁতবস্ত্র মিলবস্ত্র সর্ব্বপ্রকার তৈয়ারী পোষাক, ছোসিয়ারী ও আধুনিক ডিজাইনের ডেকরণ, টেরিলিন, টুইল ও ওয়াস্ এণ্ড ওয়ার শাড়ী বিক্রেতা।

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

বড়বাজার, কলিকাতা-৭ ফোন : ৩৩-২৩০৩

Electrical Motor, Double Ended Grinder, Polishing & Buffing, Flexible Shaft Grinder Etc.

MANUFACTURED BY

RAMKANAI ELECTRO WORKS

26/2, PRIYANATH MIDDYA ROAD. (Belgharia)

CALCUTTA-700056. *Phone* : 58-1575

With best compliments from :

RELIABLE ENGINEERS & TRADERS

25, Harachandra Mullick Street,

Calcutta-700005

Gram : DISWASHING

PHONE : { *Office* : 24-1236 / *Works* : 55-1738

PELICAN ENGINEERS

Fabricators of Stainless Steel Chemical Plants, Pharmaceutical & Fruit Preservation Equipments.

4, HARTFORD LANE. CALCUTTA-700016.

Works : 161, Upper Chitpur Road.

Calcutta-700005

গান	৮৩	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নব বৈশাখ	৮৩	নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
পঁচিশে বৈশাখ এক রূপালী আলোক	৮৬	সন্তোষ কুমার অধিকারী
স্মৃতি কৌমুদী	৮৬	✓বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠ-চক্র	৮৭	ভৈরব নাথ বাগ
সঙ্গীতে নারদা-রামকৃষ্ণ সাধক	৮৯	শ্রীসত্যীশচন্দ্র নাথ, ভক্তিরত্ন
পাক: পৃষ্ঠামি	৯২	গৌরী ধর্মপাল
Bengal Down The Ages	9	Prof. Kausambi Nath Mallik
God, Ditto and Doubt	10	Sri Asit Biswas
Memories of History	12	Sri Jyotsna Nath Mallik

স্বামী সত্যানন্দদেবের দুটি নতুন বই

কথামৃত-কথা

- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের কিছু বাণীর আধুনিকযুগসম্মত ব্যাখ্যা।

মূল্য : আট টাকা

সাধুর চলার পথে—

- দৈনন্দিন জীবনে মানুষের লক্ষ্য পথে চলার নির্দেশনা।

মূল্য : ছয় টাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন,
২, পি, কে, সাহা লেন,
কলিকাতা-৭০০০৩৬

ভক্তগণের বহুদিনের প্রতীক্ষিত ও আকাঙ্ক্ষিত সদ্য প্রকাশিত

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেবের জীবনী গ্রন্থ

করুণাবতার

শ্রীশরণাপুরী মূল্য : ১৬·০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২, পি. কে. সাহা লেন, কলিকাতা-৭০০০৩৬

শ্রীরামকৃষ্ণপদ ভরসা

৺রামাপদ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত

নারিকেলডাঙ্গা রোলার ফ্লাওয়ার মিলস্

১৭/৪, কলেজ ষ্ট্রীট রোড, কলিকাতা-৯

স্থাপিত ইং ১৮৮৮ সাল

৯৫ বৎসরের

জাতীয় প্রতিষ্ঠান

৩৫-৪১২৪
৩৫-৪১২৫

। স্বত্বাধিকারী ।

রথীন্দ্রনাথ ঘোষ এ্যাণ্ড ব্রাদার্স

সদ্য প্রকাশিত

"বাংলা সাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব"

স্বামী নীলানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্য জগতে একটি মূল্যবান অবদান

মূল্য : পঁচিশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ী, বীরভূম

শ্রীসত্যানন্দ দেবায়তন, ১ ইব্রাহিমপুর রোড, কলিকাতা-৩২

* আশ্রম পর্ব্ব পঞ্জী : ভাদ্র, ১৩৯০

১২শে	আগষ্ট,	শুক্রবার	— একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম।
২২শে		সোমবার	— রাত্রে পূর্ণিমার হোম।
৩১শে	"	বুধবার	— শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী
৫ই	সেপ্টেম্বর	শনিবার	— একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম।
৬ই		মঙ্গলবার	— রাত্রে অমাবস্যার হোম।
১৭ই		শনিবার	— একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম।

* বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পত্রিকা মতে।

57-4562

TRINAYANI ELECTRIC Co.

Engineers & Govt. Licenced Contractor

145, LAKE TOWN, Block--'A'
CALCUTTA-700085

মডার্ণ ডেকরেটর্স

শুভবিবাহ ও যে কোন উৎসবের
প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫এ, ডব্লু, সি, ব্যানার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলি-৬

ফোন : ৫৫-২৫৪৯, ৫৫-৬৫৬৪

N. G. Chakrabarti Alloy Steels (P.) Ltd.

INCORPORATING

N. G. CHAKRABARTI & CO.

Manufacturers of :

Alloy Steel Castings
SUCH AS
Nickel Chrome Steels
Heat Resisting Steels
Stainless Steels
Austenitic Manganese Steels
Made In
Induction Furnace.

2. Alloy Iron Castings
SUCH AS
Heat Resisting Alloy Iron Castings
High Duty Iron Castings
NIHARO Castings
Graded Iron Castings
OF
All Special Grades & Sizes

3. Direct Arc Electric Melting Furnaces
For Melting all Grades Steels,
Alloy Steels & Alloy Iron etc.

MIN MODEL	MAXI MODEL
SR-1—150 Kgs. Batch	SR-4—1000 Kgs. Batch
SR-2—250 Kgs.	SR-5—3000 Kgs.
SR-3—500 Kgs.	SR-6—5000 Kgs.

●

Quality Guaranteed

Works :

K-65, Howrah Industrial Estate,
P.O. Balitikuri
Howrah, (*West Bengal*)
Telephone : 69-2890

Head Office :

3D, Nandy Street,
Calcutta-700029
Phone : 42-5197
Cable : "ENGEECEE"
Calcutta

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেব প্রতিষ্ঠিত

সপ্তত্রিংশ বর্ষ	তেরশ' নব্বই	আষাঢ়	তৃতীয় সংখ্যা

তোমায় নমি বারবার

শ্রীশ্রীঠাকুর

হৃদয় রথের সারথী হে
তোমায় নমি বারেবার
চক্রব্যূহ এই ধরণী
চক্রধারী তুমি সবার।
জগত-নাথ গদাধর
শেষ-শায়ী তুমি হে
বেষ্টনকারী ভুবনের প্রভু
অন্তরযামী তুমি আবার।
নীরধীর নীলে নীল-মাধব
শঙ্খ চক্রধারী
জন্ম মরণ মোহ মুক্তি
শরণ নীলে তোমার।

—):০:(—

সম্পাদকীয় নিবেদন

[সপ্তত্রিংশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা আষাঢ়, ১৩৯০]

"ভাবমুখে" পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব পত্রিকাটির নামকরণ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার স্মরণে। মা ভবতারিণী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবতার লীলায় শুরুভাবে থাকার প্রাক্ মুহূর্তে আদেশ দিলেন, "তুই ভাবমুখে থাক", শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবময় শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ দেব শ্রীরামকৃষ্ণ নাম ও ভাব প্রসারের জন্য এই পত্রিকাটিকে মাতৃ স্নেহে লালন পালন করেছিলেন। ভাবমুখে অবস্থান ক'রে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে সব ভাব পৃথিবীর মানুষের জন্য দিয়ে গেলেন, তারই অনুসরণ এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য। শ্রীশ্রীজগদম্বার এই নির্দেশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা পাই স্বামী সারদানন্দ মহারাজের লেখা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে।

স্বামী সারদানন্দ লিখছেন—"ঠাকুরের আমিত্ব জ্ঞানের যখন একেবারে লোপ হইতেছিল তখন এই বিরাট আমিত্বের পশ্চাতে অবস্থিত অদ্বয়ের নির্গুণ ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন—তখন ঐ 'বিরাট আমি' ও তাহার অনন্ত ভাবরাজ্যে, যাহাকে আমরা জগৎ বলিতেছি, তাহার কিছুরই অস্তিত্ব অনুভব হইতেছিল না; আর যখন ঠাকুরের 'আমি' জ্ঞানের উদয় উন্মেষ হইতেছিল তখন তিনি দেখিতেছিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণ ভাবের সহিত সংযুক্ত এই সগুণ বিরাট "আমি" ও তদন্তর্গত ভাবরাজ্যসমূহ। অথবা নির্গুণভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের অনুভবে ঐ 'একমেবাদ্বিতীয়মে'র ভিতর জগত ভেদের অস্তিত্বও লোপ হইতেছিল, আর ঐ সগুণ বিরাট আমিত্বের যখন বোধ করিতেছিলেন, তখন দেখিতেছিলেন—যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, যে নির্গুণ সেই সগুণ, যে পুরুষ সেই প্রকৃতি, যে সাপ স্থির ছিল সেই এখন চলিতেছে, অথবা যিনিই স্বরূপে নির্গুণ তিনিই আবার লীলায় সগুণ। শ্রীশ্রীজগদম্বার এই নির্গুণ সগুণ উভয়ভাবে অদ্বিত্ব স্বরূপের পূর্ণ দর্শন পাইবার পর ঠাকুর আদেশ পাইলেন "ভাবমুখে থাক্"—অর্থাৎ আমিত্বের একেবারে লোপ করিয়া নির্গুণ ভাবে অবস্থান করিও না; কিন্তু যাহা হইতে যত প্রকার বিশ্বভাবের উৎপত্তি হইতেছে সেই বিরাট "আমিই" তুমি, তাহার ইচ্ছায় তোমার ইচ্ছা, তাহার কার্যই তোমার কার্য—এই ভাবটি ঠিক ঠিক সর্বদা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া জীবনযাপন কর ও লোককল্যাণ-সাধন কর। অতএব 'ভাবমুখে' থাকার অর্থ হইতেছে—মনে সর্বতোভাবে, সকল সময় সকল অবস্থায় ধারণা বা বোধ করা যে আমি সেই "বড় আমি" বা "পাকা আমি"। 'ভাবমুখ' অবস্থায় পৌঁছলে, আমি অমুকের সন্তান, অমুকের পিতা, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র ইত্যাদি সমস্ত কথা একেবারে মন হইতে মুছিয়া পুঁছিয়া যায় এবং 'আমি সেই বিশ্বব্যাপি আমি' এই কথাটি সর্বদা মনে অনুভব হয়। ঠাকুর তাই আমাদের বার বার শিক্ষা দিতেন—"ওগো, অমুকের ছেলে আমি, অমুকের বাপ আমি, ব্রাহ্মণ আমি, শূদ্র আমি, পণ্ডিত আমি, ধনী আমি—এসব হচ্ছে কাঁচা আমি, ওতে বন্ধন নিয়ে আসে। তখন ভেবে মনে করবে তাঁর (ভগবানের) দাস আমি তাঁর ভক্ত আমি, তাঁর সন্তান আমি, তাঁর অংশ আমি। এই ভাবটি মনে পাকা করে রাখবে।" অথবা বলতেন—"ওরে অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।"

[সম্পাদকীয় নিবেদন—শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্য

শ্রীঅর্চনাগুহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কেয়ার পথে আর একটি তীর্থ যত চরণ স্পর্শেছে
কালনা নগর বর্দ্ধমানের পথে
সেথায় এসে ভিড়লো তরী একটি শুভ লগ্নেতে
দু' এক দিনের তাড়া জীবন স্রোতে।

শান্তরস আশ্রয় নীড় সিদ্ধ ভগবানদাসের
তীর্থ ব'লে গণ্য সবার কাছে
হারিয়ে যাওয়া সোনার অতীত নয় তা কভু অন্তরের
চায় যে আজো পরশ মাঝে মাঝে।

নিকান্ মাটির তুলসীতলা শিউলি-তুলী আঙন কোন
ধূপল তপের হয় যে সেবা সিদ্ধি
ত্রিসন্ধ্যা নাম কীর্ত্তনেতে নিত্য যুগল পূজাজন
গন্ধ ধূপের সুবাস ভরা প্রীতি।

সিদ্ধ ভগবানজী সেবা সদাই জপ মন্ত্র গো
ভিলক সেবায় অঙ্গখানি সাজা
হরিনামের মালাখানি নিত্য করে জপ গো
নীত্য বিতায় শ্রীমুখখানি মাজা।

হঠাৎ সেদিন দুয়ার আসি জানায় তাঁরে প্রার্থনা
মোর মাতুলের বড়ই অভিলাষ
শুভলগ্নের দরশ পাওয়া, শুভেই থাকেন আমমনা
আবেশ পেলেই মিটাই তাঁহার আশ।

বৈষ্ণবকুল সৌজন্যে দিনু মধুর বাক্যেতে
সিদ্ধ সাধক শ্রীভগবানদাস
হাসিমুখি তাঁর আনন হেসে, হঠাৎ বুকের স্পন্দেতে
বুঝলো না মন কিসের উল্লাস।

জানতে নারে মন পরান জানলো না, কে তার দ্বারে
আপনি এসে হ'ল গো উদয়
একটু আভাস একটু আড়াল লুকোচুরির সন্ধ্যা রে
জাগিয়ে যেন অচিন সুবাস বয়।

অবুঝ বোঝায় বলেন শুধু হঠাৎ যেন হয় মনে
কি এক যেন দিব্য আবির্ভাব
ঘটেছে আজ এ আশ্রমে পুণ্য মধুর এই ক্ষণে
জাগিয়ে তোলে অজানা এক ভাব।

হঠাৎ সিদ্ধ সাধক বলেন বৈষ্ণব এক ভেকধারী
বৈষ্ণব রীত রাখতে পারেনি সে
গর্জে সাধু বলেন তাহার গলার কণ্ঠি নাও কাড়ি
ধর্মচ্যুত হোক সে কর্মদোষে।

অপ্রিয় সেই প্রসঙ্গেতেই মত্ত হ'ল কথায় যেন
ক্ষুব্ধ সে রোষ হয় না কোনমতে
নামের মালার গর্ভে যেন অভিশাপে মন্ত্র লেখ
এমনি ক্ষণে মুক্ত হবার পথে।

ভগবানে ভক্তির সুখ তনুর তপ জোৎস্না গো
তনুর পিছে আলতো পায়ে এসে
একটি কোণে বসেন প্রভু চরণ পরশ বন্দা গো
কুল কুলীর উঠলো যেন হেসে।

গঙ্গামোদী কৃষ্ণা শুভ্র ধূপের সুবাস মধুরি
অঙ্গবাসে বকুল ওঠে ফুটে
ভরা চাঁদের জোৎস্না ঢেলে মাটির প্রদীপ চকমি
একটি তনুর যৌবন হারায় ঘুটে।

কে এই গোপন অতিথি গো কোথায় নিবাস কোন্ দেশে
একটি মিঠে কৌতূহল মন
ভক্তবাসে শ্রীমুখ ঢাকা গোপন প্রভুর উদ্দেশে
সাধুর মুখে আগলো এবার প্রশ্ন।

পরিচয়ের প্রথম পালা সাঙ্গ করি গুণধরাধ
প্রশ্ন করে নিজ ঘরাজীরে
নিজ বাড়ি তুমি প্রভু দেশ জোড়া যে তোমার নাম
একটি কথা শুধাই তোমায় ধীরে।

জগৎ মাঝে আজও কেন সবাই করলর হায়
শুদ্ধ মালায় কি আর প্রয়োজন
মুগয়ীর হাতে সাধু অনেক রচি মন্ত্র তায়
কহেন যারা নিজ সাধক জন

লোকের তরেই সাধন ভাবের আমার সেই পন্থা যে
জগতি এ নাম লোক শিক্ষার তরে
আমার সাধন শিক্ষা বিনা ধর্ম ভাবের কই বাঁচে
ভ্রষ্ট হবে লক্ষ্য হ'তে স'রে।

চৈত্রী মেঘের চোখে হঠাৎ কাল ভ্রূকুটির বৈশাখী
গর্জে উঠে অকাল ঝড়ের ডাকে
ভক্ত মরুর বক্ষ ঠেলি জাগলো প্রলয় বন্যা কি
প্রভুর মুখে বজ্র বাণী জাগে।

কিসের এত স্পর্ধা বড় বৈষ্ণব রীত এই তোমার
ভক্তর মত এই কি সহিষ্ণুতা
ক্রোধের বশে নিজ কাছি কণ্ঠীখানি কার গলায়
অহঙ্কারে করলো উঁচু মাথা।

ভেবেছ কি কেবা তুমি কিবা তোমার শক্তি আর
লোকশিক্ষা দেবার তুমি কে?
যাঁহার জগৎ শিক্ষা দিবার তাঁরই শুধু অধিকার
নিজ সাধক মুটায় ভূমীতে।

একটু বলি শুন ঠাকুর নিবিল আবো অজবাস
সমাধিতে হ'লেন আপন হারা
দিব্য জ্যোতির মূর্ত নিবাস নিজ তনুর পরকাশ
দেখে সাধুর বইলো চোখে ধারা।

সবিস্ময়ে পেলেন এবার প্রভুর আসল পরিচয়
মৌন মুখে ভাবেন করজোড়ে
চৈতন্যের আসন 'পরে এই যে ঠাকুর নরহরি
দাঁড়িয়েছিলেন ভাবের বেসুল ঘোরে।

কহেন সাধক বড় আমি প্রভুর পরম তৃপ্ত দাস
স্বরূপ তাঁহার চিনেই যে আজ বড়
বহুদ শুধু করেছি যে অন্ত আঁখির অবিশ্বাস
বাড়িয়েছি হায় অপরাধের পথ।

প্রভুর বাণীই নিলেম মানি তৃণের তৃণ আজ হ'তে
কেবা আমি দীনেরও দীন অতি
সবার চরণ ধূলি দিয়ে বাড়িয়ে নিলেম মোর পথে
লুটিয়ে সেবায় ভুলবো পথের ক্ষতি।

এবার অন্ত যে পরাণের অনুক্ষ অপরাধের ভূল
প্রণাম আমার রইলো চরণতলে
লুটায় সাধু—নীরব গৃহ বিস্ময়েতে আজ আকুল
পলকহারা প্রহর কেটে চলে।

প্রভুর মুখে পলাশ হাসি ফুটলো গোপন রঙ্গেতে
কোথায় দিয়ে ঘটলো কি যে ক্ষণে
নত হ'ল বৈষ্ণব রাজ বিরূপ সে ভাব ভঙ্গেতে
প্রণামে আর প্রসাদ আলিঙ্গনে।

ভারতের এক গোপাল প্রেম দাঁড়ালো সেই কুঞ্জে গো
আমন্ত্রেরি মিলন মহোৎসবে
একটি সোনার কমল ঘিরে লক্ষ মধুপ গুঞ্জে গো
ভরলো আকাশ প্রেমের সৌরভে।

তৃতীয় খণ্ড

সপ্তম পরিচ্ছেদ

একটি প্রভাত চলেছে অস্ত নীড়ে
বেলা হ'য়ে আসে শেষ
কোন বিদিশার অদিশায় তার তীর
গভীর নিরুদ্দেশ।

একটি সূর্য্য নিবার অন্তরালে
কিছু আলো কিছু ছায়া
তাই দিয়ে গড়া নিয়তির খেলাঘর
একটি অবেলা মায়া।

একটি জীবন ক্রৌঞ্চের ভাষে ভাষা
মরণের সন্ধিতে
কোন বেদনার রামায়ণী লিপি ভরে
আলোর প্রপাতিতে।

তীর্থের পানা হয়ে গেছে আজ শেষ
মধুর অক্ষমনে
নত শিরে আসি দাঁড়ালো কি যেন ভাবি
নহবত অঙ্গনে।

চন্দ্রামণির পূণ্য চরণতলে
ললাটে ছোঁয়ালো মাটি
অমের স্নেহের প্রসাদ আশিস্ খানি
অঙ্গে লইল বাঁটি।

কুশল তো বাবা? কহিল চন্দ্রামণি
সন্ত্রম নতশিরে
জানালো মধুর পরম কুশল বাণী
অল্প পরে ধীরে ধীরে।

কহিল "অন্তর যাও যদি যাগো বলি
আছে কিছু নিবেদন
সন্তানে তব চাহনি তো কভু কিছু
এতই কি অভাজন।

দিয়েছে বিধাতা অতুলা সম্পদ
দীন ভাণ্ডার ভরি
তোমাদের পদধূলির প্রসাদে মাগো
সুখেরি সরব করি।

শুধু দুখ এই রাজ সন্তানে তব
ভিখারী ভাবিয়া মাতা
কোনদিন কিছু চাহ নাই দুখ ফুটে
বুকে বাজে তাই ব্যথা।"

"বালাই বালাই, ভিখারী ভাবিব কেন"?
কহিল চন্দ্রারাণী
"তব গৃহে তারা থাক্ লক্ষ্মীর ঝাঁপি
দিনু এ আশিস্ বাণী।

কি চাহিব বাছা? রাজ সন্তান যদি
অভাব রাখিত কিছু
লইতাম চাহি তাহে কিবা সঙ্কোচ
হ'ত নাকো মাথা নীচু।

কি আর চাহিব নাহি কিছু চাহিবার
আমি শুধু ভবানীরে
গোপালেরে ল'য়ে কুশলে তোমরা থাকো।"
কহিল মধুর ধীরে,

"তবে দেখো তাত আরবার জননী গো
কিছু নাহি চাহিবার"?
"তবে দেখি তবে"—কহিল চন্দ্রামণি
অঙ্কিত ভালে তাঁর

চিন্তার ছায়া যারেক ঘনালো যেন
সুনীল অভ্র মেঘে
বিরাম কান্ত নীড়ে ফেরা বন পাখী
কারে যেন গেল ডেকে।

মানসসরের দুই তীর খুঁজে খুঁজে
ক্লান্ত চন্দ্রামণি
চাহিবার মত যার নাকো কিছু পাওয়া
চুঁড়িয়া সোনার খনি।

সহসা শ্রীমুখ প্রসাদ হাসিছে তবে
"হাঁ গা বাছা পড়েছে মনে
চাহিবার মত আছে বটে মোর কিছু
লাগিবে যা প্রয়োজনে।"

কহিল মধুর,—"মাগো, বল বল বল
আর হবে নাকো ভুল,"
কহিল চন্দ্রা—"ফুরায়ে গিয়েছে বাবা
মোর কৌটার তুল।

একই যখন দিতে নার তোর মোরে
তাই দিস্ বাবা আমি
আর কিছু নয়? এক পরমার তুল"?
মধুর শুভ বাণী।

দু'চোখের কোণে গড়ায়ে পড়িল জল
দু' করে ধরা নতি
হাসিল বিধাতা যেন ভিখারীরে দিতে
কোথা তোর সম্পত্তি!

কহিল মধুর—"এমন জননী বিনা
দেবতা হয় কি ছেলে?
মধুরের মণিমন্দির ভরে রত্ন
যাঁর কৃপাকণা পেলে।"

বিজ্ঞানী ঠাকুর সত্যানন্দ

সাধনাপুরী

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কার, অভ্রান্ত সাধনা, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আলোচনা শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের খুব প্রিয় বিষয় ছিল। তাই ধর্ম্মোন্নতির ক্ষেত্রে শ্রীঠাকুরকে দেখতুম বৈজ্ঞানিক পন্থার সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের ধর্ম্মোন্নতির ব্যাপারে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। একদিন সাধু ও মহাপুরুষ বা অবতার পুরুষ বা শক্তিমান গুরু এঁদের প্রসাদ খাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন—

শ্রীঠাকুর—এই যে সাধু মহাত্মা, অবতার পুরুষ বা অবতার কল্প পুরুষ, গুরু এঁদের প্রসাদ খাওয়া—এর বিশেষ ফল আছে। আমি অবশ্য আমার প্রসাদ দিই অল্প, চরণামৃতই বেশী করে থাকে, কিন্তু ওই প্রসাদ বা চরণামৃত খাওয়া কেমন জান? ডাক্তারী শাস্ত্রে কতকটা serum injection দেওয়ার মত। রোগী যখন কোন বিশেষ বিশেষ রোগে ভোগে যেমন Diphtheria Tetanus প্রভৃতি, তখন তার রক্তে শক্তি শালী ঘোড়ার রক্ত থেকে তৈরী serum inject করে দেওয়া হয়। ঘোড়ার রক্তে তো খুব তেজ। সেই উচ্চ শক্তি সম্পন্ন জীবাণুধ্বংসী serum পরমাণুগুলো রোগীর শরীরে গিয়ে ঐ রোগ জীবাণুধ্বংসী serum পরমাণুগুলোকে ধ্বংস করে রোগীকে আরোগ্যের পথে নিয়ে আসে, এতে রোগ প্রতিষেধক শক্তি বা immunity-ও বাড়ে এবং রোগী সুস্থ থাকে। এই serum একাধিকবার injection দেওয়ার প্রয়োজনও হয়।

এ জগতে যে সব মহাপুরুষ, অবতার পুরুষ আসেন, তাঁরা ত সব জগত আসেন। তাঁদের সান্নিধ্যে বা তাঁদের শরীরে এই জগতের ভোগ বিলাসিতার, কামনা বাসনার germs তো প্রবেশ করতে পারে না—তাঁদের চারপাশে ঐগুলি ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, ফলে তাঁদের আত্মার বা শরীরের জ্যোতি ও তেজস্বিতা আরও বেড়ে যায়।

এখন তাঁরা ভক্তদের যে সব প্রসাদ যেন বা হয়তো কারোকে স্পর্শ করে আশীর্বাদ করেন, তাতে তাঁদের ঐ শক্তি ভক্তদের মধ্যে আপনা থেকে injected হয়ে যায়। অবশ্য যিনি প্রসাদ দেবেন বা আশীর্বাদ করবেন তাঁকে ঠিক খাঁটি হওয়া চাই। ভেতরে যদি গোলমাল চোরাবালী থাকে তাহলে কিন্তু হবে না।...

আমার মহাপ্রসাদ দিয়ে injection তৈরী করিয়ে ছিলাম...হিন্দুস্থান ড্রাগ হাউস থেকে—সেই Injection দিয়ে অনেকের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছিল। আর সন্তোষের মধ্যে তো ব্রহ্মচর্য্য নেবার মত মনের সংযম এসে গেল। তো কথা হচ্ছে এই যে, মহাপুরুষদের পদধূলি, বা দেবতার চরণামৃত খাওয়া এসবের একটা effect আছেই। এতে যেমন পবিত্র হয়। মানুষকে নিয়ে যায় কল্যাণের পথে, মঙ্গলের পথে।

(শ্রবণ মঙ্গলম্ তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'টাকা মাটি মাটি টাকা' বাণীটি বহু বৃষ্টি ভঙ্গী দিয়ে ব্যাখ্যা করলেন শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও করলেন।

'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলে গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন, মানেই ত্যাগ করলেন। ত্যাগ করা মানে আর কিছু নয় একটা Shock দিলেন—তার ফলে পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনগুলিতে, রামকৃষ্ণ মঠগুলিতে টাকা অমি, বাড়ী ইত্যাদি হুড় হুড় করে আসছে। টাকারূপী লক্ষ্মীকে গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন, আবার প্রার্থনা করলেন, 'দেখিস মা, যেন আমাকে বন্ধ করিস না।' অর্থাৎ দুমুঠো পেটভরা আহার যেন দিস, লক্ষ্মী ছাড়া করিস না। এখন ঠাকুর তো নারায়ণ, যা লক্ষ্মী যাবেন কোথায় নারায়ণের চরণ ছেড়ে, তাই সত্যযুগে সহস্রগুণে ঠাকুরের নামের জপে জোড়া মঠ মিশনগুলিতে, সেবাকেন্দ্রগুলিতে আবির্ভূতা হচ্ছেন—ঐশ্বর্য্য ঢেলে দিচ্ছেন। বিজ্ঞানের একটি তত্ত্ব হচ্ছে each action hee an equal and opposite reaction সেই নিয়মানুসারেও বলা যায় নারায়ণের কাছে অর্থরূপী মালক্ষ্মী থাকা পেয়ে ঐশ্বর্য্য উজার ক'রে ঢেলে দিলেন যা দিচ্ছেন রামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে।

(শ্রবণ মঙ্গলম্ ৪র্থ খণ্ড)

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী 'তিনি যেন চুম্বক আর ভক্ত যেন লুঁচ, আরও ভক্ত কখনও হন চুম্বক আর ভগবান হন লুঁচ।' এই বাণীর সম্বন্ধে শ্রীঠাকুর যেন কিছু কথা বলার পর বললেন,—

'চুম্বকের স্পর্শে লোহা চুম্বক হয়ে যায় একথা বিজ্ঞানের এক প্রমাণিত সত্য। কাজেই ভগবৎ নামে ও চিন্তায় ভক্ত যে চুম্বক হবে একথা স্বতঃসিদ্ধ।

বিজ্ঞানে বলে বিরাট এক magnetic field এ পড়লে একমাত্র কাঠ ইত্যাদি non conductor পদার্থ ছাড়া যে কোনো ধাতু চৌম্বকত্ব লাভ করে, লোহার তো কথাই নাই। steel সবচেয়ে বেশী magnetised হয়ে যায়। ভক্ত যেন এই steel metal। ভগবানের স্পর্শে সে চৌম্বক শক্তি লাভ করে ও ভগবানকেও আকর্ষণ করে।'

শ্রীঠাকুরের কথায় সন্তোষবাবু বললেন, 'ঠাকুর আপনি ঠিকই বলেছেন। পদার্থ বিজ্ঞানের আর একটি মত যে লোহার মধ্যে যদি high Voltage বিদ্যুৎ অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সাধারণ লোহাই পরিণত হয় বিরাট চৈম্বাকিক চুম্বকে।

শ্রীঠাকুর বললেন—সেজন্য সাধক বা ভক্ত, সেই ব্রহ্ম বিদ্যুৎ বা ভগবৎ-বিদ্যুতের স্পর্শে লাভ করে বিরাট চৌম্বক-শক্তি, আর ভগবানেরই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ভগবানকেই করে আকর্ষণ। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত মুখে ভগবান বলেছেন,—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।

(শ্রবণ মঙ্গলম্ ৪র্থ—৭৩)

একদিন কথা-প্রসঙ্গে ভগবৎ অস্তিত্ব বা বিরাট বিশ্বের পেছনে একটি চেতন সত্তা, বিরাট পরিকল্পনাশীল মনের অস্তিত্ব এ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীঠাকুর তাঁর বিশেষ বিজ্ঞানী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বললেন,—

'আইনষ্টাইনের theory of relativity আবিষ্কৃত

হওয়ার পর matter energy-র মধ্যে পার্থক্য বিশেষ রইল না, পদার্থ শক্তিতে বা matter energy তে আর energy matter-এ রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব এটি জানা গেল। খুব অল্প পরিমাণ পদার্থকে যদি রূপান্তর ঘটানো যায় তাহলে তার থেকে প্রচুর পরিমাণে শক্তি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু খুশী মত রূপান্তর করার মত অতখন furnace (চুল্লী) আমাদের পৃথিবীতে নাই, সেটী আছে সূর্যের মধ্যে। সূর্যের আছে কার্বন, নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন প্রভৃতি অনেক কিছু এগুলির thermo fusion থেকে উদ্ভূত শক্তিই সৌরজগতকে উপযুক্ত পরিমাণ তাপ দিতে পারে বা দিচ্ছে। এই সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা বহু গবেষণা করে জেনেছে। অঙ্ক কষে হিসাব স্থির করেছে সূর্য্য প্রায় তিন কোটী বছর ধরে সৌরজগতকে এমনি ভাবে তাপ দিচ্ছে আর সূর্যের মধ্যে যতদিন এক অণু হাইড্রোজেন বর্ত্তমান থাকবে ততদিন এই thermofusion কাজ চলবে। আরও আন্দাজে সারা বিশ্বে এক তৃতীয়াংশেই হাইড্রোজেন কাজেই সূর্যের মধ্যে এখনও যা পদার্থ আছে। তার থেকে কয়েক শত কোটি বছর এমনিভাবে তাপ দান করে সৌর জগৎকে বাঁচিয়ে রাখবে। এই বিরাট সৌর জগৎ থেকে আরম্ভ করে একটি ক্ষুদ্রতম ইলেকট্রন প্রোটনের মধ্যেও আমরা দেখছি কতকগুলি নিয়মশৃঙ্খলা। কাজেই সকলকে এক-বাক্যে স্বীকার করতে হবে যে, জগতের উর্দ্ধে এই stellar region কে বাঁচিয়ে রাখার কি সুন্দর ব্যবস্থা। হাক্সলি প্রমুখ কয়েক বলবেন, এটি হয়ত হঠাৎ ঘটিত কোন এক ঘটনা, যেমন কতকগুলি বাঁদর যদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ কম, তারাও যদি হাজার হাজার বছর type যন্ত্রের ওপর আঙুল দিয়ে ঠোকাঠুকি করতে থাকে তাহলে তারাও হয়তো কোন দিন accidentally একটি সেক্সপিয়ারের কবিতা লিখে ফেলতে পারে। সেইরকম জগতের পেছনে কোন নিয়ামক শক্তি নাই। জগৎ সৃষ্টি হয়েছে accidentally কিন্তু এই উদাহরণ আমরা মেনে নেবো না। আমরা সকলেই বলব, এই উদাহরণ অনেকাংশে ভুল কল্পনা বা ভ্রান্ত ধারণা। কেননা বাঁদর কখনও সহস্র সহস্র বছর ধরে type writer চালাতে পারবে না তার আগেই ভেঙে ফেলবে যন্ত্র। তা'ছাড়া যদিও তারা type করে চলে তবুও তাদের হাজার বছরের type এর মধ্যে accidentally একটি কবিতা type হলেও বাকী সবই অপোছাল ও ভুল থাকবে তার মধ্যে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে আমরা যা কিছু দেখছি, তার মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা, রূপ পারিপাট্য, কল্যাণ, মঙ্গল বর্ত্তমান রয়েছে। কাজেই আমরা কি করে বলব, বিশ্বপ্রকৃতির পেছনে নিয়ন্ত্রণকারী কোন বিরাট মন বা চেতন সত্তা আছে।

আণবিক পদার্থ থেকে শক্তিতে রূপান্তর সাধিত করে যে অনুবিক্ষণযন্ত্র তার নাম সাইক্লোট্রন (cyclotron) আমাদের পৃথিবীতে পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণায় যাবতীয় সাইক্লোট্রন যন্ত্র তৈরী করতেই অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন কাজেই অনুমান করা যায় যে সূর্য্যের মধ্যে যদি বিরাট সাইক্লোট্রন জাতীয় কোন যান্ত্রিক পদ্ধতি থাকে তার স্রষ্টা বা নিয়ন্ত্রণকারী কে? সেই হিসাবে একটি বিরাট সত্তা স্রষ্টা বা মেনে কোন উপায় নাই এবং তিনিই আমাদের ঈশ্বর বা ভগবান। তিনিই পরম ভেজস্বরূপ, বীর্য্যস্বরূপ, ওজস্বরূপ একথা আধুনিক বিজ্ঞানের frof eddington প্রমুখ কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক বুঝতে সক্ষম হয়েছেন কিন্তু বৈদিক যুগে যান ও সাধনার দ্বারা সেই হাজার বছর পূর্ব্বে ঋষিরা একথা জেনেছিলেন বলেই বিরাট শক্তির কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করেছিলেন ;—

'তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি
বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি
বলমসি বলং ময়ি ধেহি
ওজোঽসি ওজো ময়ি ধেহি'।

শ্রীঠাকুর সন্ধ্যানন্দদেব প্রতিদিন শ্রীমদ্ভাগবদগীতা পাঠ ও ভাষ্য করতেন। আমি সেগুলি ধারাবাহিক ভাবে লিখে রাখতুম। শ্রীঠাকুর সেই গ্রন্থগুলির বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ভাষ্য করতেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েও কিছু কিছু গ্রন্থ ভাষ্য করেছেন। এখানে গীতার বৈজ্ঞানীক ভাষ্য

কিন্তু ভুলে গেলে বোঝা যাবে শ্রীঠাকুরের বিজ্ঞান প্রীতি কতখানি ছিল।

মাত্রা স্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।

এই মন্ত্রটিতে কৃষ্ণ ভগবান বললেন—ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়াদির সংস্পর্শই শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখ ইত্যাদি প্রদান করে এই অনুভূতি অস্থায়ী সেজন্য এসব সহ্য কর। ২।১৪

শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ ভাষ্যমুখে পাই মাত্রাস্পর্শ আসে চলে যায় অর্থাৎ অস্থায়ী। Impressions ও আসে চলে যায়। মাধ্যম দেয় মন। চিৎ সত্তার রশ্মি মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে পড়ছে বস্তুর ওপর, বস্তুটি উত্তপ্ত বা আলোকিত হচ্ছে। কিন্তু মাধ্যম যদি জড় না হয় তাহলে অবিকৃত থাকে। যেমনের মধ্যেও যতটুকু জড় যতটুকু crude ততটুকুই susceptible. তারই বিকৃতি। যদি Vacuous medium হয় তার মধ্যে দিয়ে প্রকাণ্ড তাপ প্রবাহিত হলেও সে নিজে অবিকৃত থাকে প্রচণ্ড আলো প্রবাহিত হচ্ছে কিন্তু মাধ্যম Vacuous তাই এতটুকু বিকৃতি পাচ্ছে না তেমনিই আমাদের যেটুকু স্থূল সত্তা তারই বিকৃতি। সূক্ষ্ম অংশ অবিকৃত। তাই Impressions আসুক যাক্, তারা একান্তই আগমাপায়ী।' (গীতার বাণী ১ম খণ্ড ৪১)

গীতা দ্বিতীয় অধ্যায়ে সপ্তদশ মন্ত্রে 'অবিনাশী তু তদ্ বিদ্ধি' ইত্যাদি অংশে ব্যাখ্যা মুখে শ্রীঠাকুর বললেন,—

বেদান্ত মতে তদ্ পদার্থ ব্রহ্ম বাচক। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ। এই তদ্ পদার্থ অবিনাশী।

পাশ্চাত্য দর্শনে নাশ মানে পরিবর্তন হওয়া বা অন্য-রকম pattern হওয়া। Law of conservation of energy অনুসারে জগতের total energy কখনও নষ্ট হয় না। সূর্য ইত্যাদির থেকে যে energy dissipated হচ্ছে সেটি আর একটি জায়গায় জমা হতে হতে নতুন সৃষ্টির রূপ নিচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে নষ্ট কিছুই হচ্ছে না। পরিবর্তন হচ্ছে মাত্র। কাজেই পাশ্চাত্য মতেও total energy-র কোন নাশ নাই। এই total energy-ই আমাদের ঈশ্বর বা পুরুষোত্তম।

(গীতার বাণী [বেদান্তদা] ১৪—৫০)

গীতা তৃতীয় অধ্যায় চতুর্দশ মন্ত্রে পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ—যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো মন্ত্রটির ব্যাখ্যামুখে শ্রীঠাকুরের বৈজ্ঞানিক ভাষ্যটিও খুব ভাল।

তৃতীয় অধ্যায় 'যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।' মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যায় শ্রীঠাকুর বললেন আত্মতৃপ্তি কথার মধ্যে static অবস্থা বলা হয়েছে, আর আত্মরতি কথার মধ্যে dynamic অবস্থা বলা হয়েছে অর্থাৎ ভগবানকে নিয়ে নাচ, গান, কীর্তন ভোগারতি, সেবা পূজা ইত্যাদি বিলাস আত্মরতির যে লক্ষণ সেগুলি সবই তো dynamic আর আত্মতৃপ্তি কথার মধ্যে statico-dynamic অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। স্থির সুখাসনে ভগবৎ উপলব্ধি করে চলেছেন অথচ চোখেমুখে একটা সন্তোষের দীপ্তি, তৃপ্তি ছড়িয়ে পড়ে, বিচ্ছুরিত হয় এটি তাই statico dynamic অবস্থা। (গীতার বাণী ১ম খণ্ড ২৬৮)

গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বললেন, যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় ও অধর্মের প্রতিষ্ঠাও যাকে বা উদ্ভব হয় তখনই আমি নরদেহে অবতীর্ণ হই।

'অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।'

এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনাও করেছেন বলেছেন জড় বিজ্ঞানের একটি তত্ত্ব conservation বা সংরক্ষণ-শীলতা কোন বস্তু যদি বাইরের force দ্বারা displaced হয় বা হবার উপক্রম হয়, তাহলে তার মধ্যে থেকেই force of restitution তৈরী হয় এই force গুলি বস্তুকে displaced হতে দেয় না। সুতরাং যখনই আমরা disturbed হই বা ক্ষুব্ধ হই বা হবার আশঙ্কা এসে পড়ে, তখনই আমাদের মধ্যে এমন সব forces of restitution আসে যার ফলে আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা সংরক্ষিত হয়। Resultant of all such forces of restitution আমাদিগকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে স্বস্থানে তাই এই resultant emergence অবতার স্বরূপ। যাঁর সৃষ্ট সমস্ত জগৎ তাঁর emergence-ই আমাদের রক্ষা করে বিচ্যুতি বা বিনষ্টির হাত থেকে।'

(গীতার বাণী ১ম খণ্ড—৩৭৭)

কৃষ্ণ ভগবান গীতায় বলেছেন,—মনুষ্যগণ আমাকে যেভাবে ভজনা করে আমিও তাদের তদ্রূপ ফল দান করে তাদের অনুগ্রহ করি। মনুষ্যগণ সর্বথা আমারই পথ অনুসরণ করে ; চতুর্থ অধ্যায়ের এই মন্ত্রটির অংশ বিশেষ বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীঠাকুর গতিবিজ্ঞানের তত্ত্ব উল্লেখ করে বুঝিয়ে দিলেন—

'গতি বিজ্ঞানের orbital motion বা কক্ষাবর্তন সম্বন্ধে একটি তত্ত্ব—motion under central force or acceleration. কোনো কেন্দ্র শক্তির আকর্ষণে অন্যকণা গতিশীল হয়। কেন্দ্র শক্তি অন্যকণাকে তার চারপাশে কোনো এক কক্ষপথে ঘুরিয়ে নেয় এবং এই আবর্তন হয় একটি closed conic বা কক্ষপথ ধরে। পুরুষোত্তম তত্ত্বটি সমস্ত বিশ্বের ক্ষেত্রে 'সূত্রে মণি গণাইব' অবস্থান করছেন এবং প্রতিটী বস্তুই তাঁকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। ঠাকুরের বা পুরুষোত্তমের বিশ্বমোহা কেন্দ্রীয় আকর্ষণ। আমরা সেই টানে যে যার পথে ঘুরছি। কিন্তু ঘুরলেও 'সূচী বাঁধা আছে বলেই আমাদের আবর্তন যে ভাবেই হোক না কেন তা ঠাকুরের বাঁধনেই অনুবর্তন। ঠাকুরকে কেন্দ্র করে কক্ষাবর্তন। আমরা যদি কোন রকমে এই কেন্দ্রীয় শক্তির আকর্ষণের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলি তাহলে আমরা যে কোন infinitum-এ গিয়ে পড়ব অর্থাৎ বিনষ্ট হব সেটি চিন্তার অতীত। ঠিক এমনি ভাবে মানুষের মধ্যেও যদি কেউ বহুদিন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য সম্পন্ন হয়ে যেমন খুশী তেমনি চলে, তবে সে বিনাশের পথে এগিয়ে যায়।

(গীতার বাণী ১ম খণ্ড ২১৭)

আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হলে গুরুর চরণে প্রণিপাত করা—নত হওয়া—গুরুর সেবা দ্বারা গুরুকে প্রসন্ন করে পরিপ্রশ্ন অর্থাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা বা আধ্যাত্মিক প্রশ্নাদি করলে তখন তত্ত্বজ্ঞানী গুরু প্রসন্ন হয়ে তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করবেন একথা কৃষ্ণ ভগবান গীতামুখে চতুর্থ অধ্যায়ে বললেন—শ্রীঠাকুর সন্তানবন্দনের ভাবমুখে বললেন—Law of thermodynamic's-এর দ্বিতীয় law অনুসারে energy কখনও উর্ধ্বস্তরে বিস্তৃত হয় না। Energy always flows from higher to lower potential অর্থাৎ বৃহৎ শক্তি থেকে energy dissipated হয়ে lower level-এ প্রবাহিত হয়। যতই difference of potential বেশী হবে আধার্য্য শক্তি বিচ্ছুরিত হয়ে তত বেশী জমা হবে। কাজেই তরুশক্তি আধার্য্য শক্তি ধরতে গেলে যত নীচু হবে ততই কৃপা বেশী হবে। আর Hydrostatics-এর law—জল সব সময়ই higher level থেকে lower level-এ জমা হয়। কাজেই কৃপাবারি ধরতে গেলে উঁচু বা অহংকৃত হলে হবে না। নীচু হতে হবে (বেদজ্ঞতা)।

(গীতার বাণী ১ম—৪৭১)

ঐ মন্ত্রেরই 'পরিপ্রশ্ন' শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীঠাকুর বলছেন—পরিপ্রশ্ন অর্থাৎ গভীর প্রশ্ন। এ কথার বৈজ্ঞানিক যুক্তি ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করলে বলা যায় theory of resonace-এর কথা। এই theory তে বলে,—'একই সুরে বাঁধা অনেকগুলি বাদ্য যন্ত্রের একটি যন্ত্রে যদি আঘাত করা যায় তাহলে সেই vibration বা কম্পনে সেই সুরে বাঁধা অন্যান্য যন্ত্রগুলিতেও অনুরণন বা সুর-তরঙ্গ সৃষ্টি করবে। কাজেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভার্থে যদি আমাদের মনকে পরিপ্রশ্নের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা জিজ্ঞাসার উপযুক্ত করে tune করি তাহলে গুরুর কাছ থেকে ব্রহ্মবিদ্যা জিজ্ঞাসার উত্তররূপে resoname বা vibration automatic ভাবেই পেয়ে যাব সব, তিনি ব্রহ্মবিদ্যার উত্তর না করে থাকতে পারবেন না। এখানে মনে রাখতে হবে যে মনের সূক্ষ্মতা বা sharpness যত বেশী হবে তত resonance হবে, আর damping বেশী হলে vibration কম হবে। যেমন তবলা ইত্যাদি যন্ত্রে vibration কম হবে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তারের যন্ত্রে vibration বেশী হবে। (গীতার বাণী ১ম ৪৭৩)

আমার আত্মকথা

শরণাপুরী

জানি তোমরা বলবে এতো ইতিহাস ... কিন্তু তোমাদের কাছে এসব ইতিহাস হতে পারে, আমার কাছে এসব ইতিহাস নয় কারণ আমার বুকে এখনও প্রভাকাশ্মৃতিবিধুর মধুরতা বর্তমান। এখনোও শ্রীঠাকুরের পাদস্পর্শ আমার অঙ্গে অঙ্গে ... মনে তারি উপবিষ্টির সুখানুভূতি ...। আজো আমার চোখের সামনে ভাসছে ঐ যে শ্রীঠাকুরের দিকে চেয়ে একে একে গেয়ে চলেছে অধর মুখোপাধ্যায়, দেবু পাল, দেবু দত্ত, বিজেন গুপ্ত, দিলীপ দাস, মনহর ভট্টাচার্য্য, শ্যামল মিত্র, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় অমিল বসু ... তনতে পাচ্ছ না সাড়ি মাসী, বন্দনা সাধুখাঁ মেকালী চক্রবর্ত্তীর সুমিষ্ট মধুর কবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কীর্ত্তনের ঝঙ্কার ...। সত্যি বলতে দোষ কি—আস্রাণ পাচ্ছ না? ছুটে আসছে কত বিচিত্র সেন্টের গন্ধ ...। তবে সব কিছুর যেমন শেষ আছে তেমনি সেদিনকার সেই মুখরেলা রাত্রির সমাপ্তি হলো ... রাত্রের যবনিকা ছিন্ন করে দোলন চাঁপা রঙের প্রভাত ও, দেখা দিল।

ভি, এল রায়ের লেখা চন্দ্রগুপ্ত নাটক পড়নি? সেই যে ম্যাসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডার বিশ্বিজয় করতে করতে ভারতে যখন এলেন সেই সময় একদিন তিনি সভা-মধ্যে বলেছিলেন—সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ। দিনে প্রচণ্ড রৌদ্রে গাঢ়নীল আকাশ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে যায় আর রাতে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোছনায় স্নান করিয়ে দেয়। আমার ঠিক সেই অবস্থা দিনে জনার্দন চক্রবর্ত্তী, ত্রিপুরারি সেন শাস্ত্রী, অতিসেতুর মুখোপাধ্যায়, সন্তোষনাথ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ রমা চৌধুরী, উমা রায়ের জ্ঞানগর্ভ ভাষণের অমৃতময় গাম্ভীর্য্য ...আর সন্ধ্যায় —দক্ষিণারঞ্জন বসুর, নির্ম্মল দাস, প্রভাত কিরণ বসু (কালাবাবু) মঞ্চে আসী মিত্রা যতীন্দ্র প্রসাদ জীবন স্যামাল অনপ্রভা ভাদুড়ী প্রমুখ কবিদের ব্রহ্ম মাধুর্য্যের ভাব হিল্লোলে হৃদয় মধুর রসায়িত—কানে আমার এখনো ভাসে অনপ্রভার উদাত্ত কণ্ঠ—

তুমি যে জাহ্নবী ধারা, ভক্তি প্রেম
যুক্তিপ্রাণী, নিত্য অবিরাম
রামকৃষ্ণ পরম হংস দেব, তোমাকে প্রণাম
সহস্র প্রণাম—

এরপর—

ওই যে বীরদর্পে উঠে দাড়ালেন কবি নির্ম্মল দাস। তার তনু খর্ব্ব হলেও ভাষা কিন্তু তার বিশ্লিষ্ট। বল্লেন—

তুমি এস তবে তরাট প্রাণের পরমপুরুষ যুগাবতার
পরশী তোমার বিহনে আজি নিবিল বিশ্ব অন্ধকার
অস্থিতে যদি কৃষ্ণের আসে, তব বাণী হত অমৃত গীতা
খৃষ্টের আগে হইলে উদয় খৃষ্টান তোমায় জানিত মিতা
মহম্মদের অগ্রে আসিলে কুর্নিশদিত মুসলমান
তোমার মাঝারে সব অবতার খুঁজিয়া পেয়েছে পরমস্থান

তার বিশ্বাসের ঝঙ্কার সবাইকে মোহিত করল। এমনি মুগ্ধ মোহিত অবস্থায় কিছুটা সময় কাটার পর শ্রীঠাকুরকে নতি জানিয়ে ওই সোম বন্দে আসি মিত্রা কি বলছে—

সেই যুগ সন্ধি দিনে
এসেছিলে হে অধিনায়ক
এনেছিলে সঙ্গে তব সীমাহারা
আলোর পিপাসা
ভরে তব ধরাতল, তুমি চোখে
প্রেমের সায়ক,
কথামৃত, রামকৃষ্ণ বর্ষে বর্ষে
অমৃতের ভাষা—

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তার অন্তরের শ্রদ্ধা সবার অন্তরকে স্পর্শ করলো অতি আলতো ভাবে অলক্ষে—

এবার যতীন্দ্র প্রসাদের সাত কণ্ঠের হিল্লোল সুরু হলো—

চির ভাস্কর চন্দ্রমাসম জীবন তোমার অতুলনীয়
অতুল অসীম মধ্যাপারাবার, আলোময় যেন লক্ষ্যণীয়
উষর ধূসর মরুভূমি মাঝে পরম শীতল মরুদ্যান
অন্তরে তব স্পর্শ লভিতে জনসংঘ লোক করেছে ধ্যান
শাশ্বত ঘনে হও মহাধনী যদিও নিঃস্ব বস্তু—
দান দিতে দিতে হওনি মুহূর্ত, আজি তাই মন কন্দুতর
বহু নাস্তিক হয়ে আস্তিক চরণে আসিয়া লুটালো মাথা
কোটিপতি ঐ নাস্তি লভিতে এসে দেখে যায় অসমাপ্ত।
মহা আলোড়ন জেগেছে ভুবনে একি অঘটন ঘটেছে আজ
মহা মিলনের মিলন তীর্থ গড়িয়া উঠিল গঙ্গাতটে।
ভালো সেকি কণ্ঠ যতীন্দ্র কি তার গভীরতা—

নরেনদেবের কবিতা শুনেছ—শোন কি তো শোন মন দিয়ে—তার দীর্ঘতম কবিতার এই দুটি লাইন যেন শ্রীরামকৃষ্ণের মরমকে জনে জনে বুঝিয়ে দিতে চায়—

পাপীরে কখন করিতে না ঘৃণা
লভিতে সাগরে মুক্তি দিতে
মানুষের মাঝে দেবতা চিনিতে
প্রতিভার সাথে পাতাতে মিতে

এসো ফিরে রাম, এসো হে কৃষ্ণ সাথো দুর্নীতি হে
সবার
তাজো বামনরূপী হরধনু পুনঃ পার্থে ধরাও ধনুঃশর
ধর্মের গ্লানি চারিদিকে আজ মানবাত্মের ক্রন্দনে
তোমরা না এলে ঘুচাবে কে বলো বিশ্বের এই
বেদনভার
তুমি তো ছিলে না উদাসীন প্রভু, মানুষের দুখে
কাঁদিত প্রাণ
আপাত তোমার কুণ্ডলিনীরে ধীরের বীর্য্য
করুক দান

—আর্তকণ্ঠে সাবিত্রী প্রসন্ন আমাদের প্রাণের যেমন লহরী—

যন্ত্রণার দাবদাহে জ্বলে অবিরাম,
তোমার পবিত্র নাম
জিহ্বায় যদি বা লই—মন থাকে তোমা
হতে দূরে
অন্তরের অন্ধ অন্তঃপুরে
তুমি দেবে না আলো ? চেতনার সব
জন্ম লাভ
সেকি মোর হবে নাক—ক্রান্তদর্শী
তোমার অভাব
পরম তৃষ্ণায় তুমি কর প্রজ্বলিত
এ অস্থির চেতনায় কর জাগরিত
তোমার অমোঘ মন্ত্র
সর্ব্ব দেহময়। ঘুচাইয়া দাও তা অক্ষয় অব্যয়
সকল সন্তাপহারী করুণার স্পর্শ অনুপম
পলে পলে এ মৃত্যুছায়া হতে ওগো সর্ব্বোত্তম
লয়ে চলে আলোকে তোমার
যত ভ্রান্তি যত অহংকার
তোমার চরণে প্রভু অকুণ্ঠিত আত্মসমর্পণে
নিঃশেষ করিতে দাও, তোমার প্রসাদ
দাও যদি কণামাত্র, সে অপূর্ব্ব অমৃতের স্বাদ
ঘুচাবে এ জীবনের পুঞ্জীভূত অসংখ্য প্রমাদ

কবির ভাবাবেগে সকল শ্রোতার চোখ ভিজে ভিজে হয়ে উঠলো, কিন্তু পরক্ষণেই সভাই চোখের জল বিসর্জন করতে উঠে দাঁড়ালেন শশাঙ্ক সেখর।

কিবা চাও তুমি মোর কাছে স্বামী
করো নাক আর ছল
মুক্ত প্রাণের পূজায় লবে কি
এক মুঠো আখিজল

কৃষ্ণচূড়ার চলে' পড়া ডালগুলোর কচি পাতায়া ফাগুন হাওয়ার সঙ্গে মেতে ছুলছে···কিন্তু শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ তখনো আসেনি। শ্রীঠাকুরের চরণে নতি জানিয়ে এক সময় শশাঙ্কবাবু থামলেন আর শ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদ নিয়ে প্রভাত কিরণবাবু উঠলেন তার রচিত কবিতা বলতে—

তার দীর্ঘ কবিতা কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের তব স্তুতি করলো না তিনি আমাদের ঠাকুরের আগমন সম্বন্ধে অনেক ভণিতা করে শেষে বললেন—

জীবনে যেদিন ক্লান্তি নামিবে আমাতে যেদিন আহত হবে
চলে এসো এই বিরাম কুঞ্জে, নীরবতা মাঝে আমারে রবে—শ্রীঠাকুরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন কবির উক্তিতে উপস্থিত ভোক্তাদের প্রাণ উজ্জল হলো—

এর পর প্রাণের ভাষা কথার মালায় সাজিয়ে বলতে উঠলেন কবি সাহসীল—

তুমি তো দূরের নও, আমাদের একান্ত আপন
তুমি যে, এ মৃত্তিকার প্রেম ভরে রেখেছ চরণ

কথামৃত-কথায় সত্যানন্দ সঙ্গীত

স্বামী বোধানন্দ

[২]

মায়ের আলোয় প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে কত জনের অঙ্গন দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন দক্ষিণেশ্বরের সেই আশ্চর্য্য পুরুষ। দিব্যনিস্তব্ধ মোহন হাসি হেসে দাঁড়িয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাড়িতে আর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কমল কুটিরে।...বিদ্যাসাগরের কাছে বসে গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ। পণ্ডিত বিদ্যাসাগর নিস্তব্ধ হয়ে একদৃষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখছেন।...ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হয়ে সহাস্যে বলছেন বিদ্যাসাগরকে—"যিনিই ব্রহ্ম, তাঁকেই মা বলে ডাকছে।

'প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে / সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি বোঝ মা রে মন ঠারে ঠোরে।'

রামপ্রসাদ মনকে বলছে—'ঠারে ঠোরে বুঝতে।' এই বুঝতে বলছে যে যেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলছে—তাঁকেই আমি মা বলে ডাকছি। যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় বলে বোধ হয় তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, পুরুষ বলি; যখন তাঁরি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন তখন তাঁকে শক্তি বলি, কালী বলি; পূর্ণজ্ঞান হলে এক চৈতন্য বলে বোধ হয়। পূর্ণ জ্ঞানে দেখে, যে সেই এক চৈতন্য, এই জীবজগৎ, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছে। তবে শক্তি বিশেষ। তিনিই সব হয়েছেন বটে। কিন্তু কোনখানে বেশী শক্তির প্রকাশ, কোনখানে কম শক্তির প্রকাশ। এই আদ্যাশক্তি আর পরব্রহ্ম অভেদ। একটিকে ছেড়ে আর একটিকে চিন্তা করবার যো নাই। যেমন—জ্যোতিঃ আর মণি। মণিকে ছেড়ে মণির জ্যোতিকে ভাববার যো নাই। আদ্যাশক্তিই এই জীব-জগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। অনুলোম আর বিলোম।...মানুষে তাঁর বেশী প্রকাশ। মানুষের মধ্যে সত্ত্বগুণী ভক্তের ভিতর আরো বেশী প্রকাশ।"...

এরপর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন এলেন কেশবচন্দ্রের বাড়ীতে। ব্রাহ্মনেতা কেশব এখন ব্রহ্মময়ী মাকে মানেন, মাকে ডাকেন বিভোর হ'য়ে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দময়ী মায়ের কথা তাঁকে বলছেন—"মা। কি মা? জগতের মা। যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন। যিনি তাঁর ছেলেদের রক্ষা করছেন, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—যে যা চায়, তাই দেন। ঠিক ছেলে মা ছাড়া থাকতে পারে না। তার মা সব জানে, ছেলে

যায় দায় বেড়ায়, অথচ আসে না।...আনন্দময় আর আনন্দময়ী। যার বাপ জানে আছে, তার মা জানেও আছে। যিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি।"

পুরুষ প্রকৃতি দোঁহা
আদ্যাশক্তি সনাতনী
নিষ্ক্রিয় নির্গুণ যবে
ব্রহ্মবলে তারে জানি।
জগৎ জননী সে যে
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়িনী
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ
চতুর্বর্গ প্রদায়িনী।

অঘটন ঘটনের অলৌকিক রহস্য—উড্‌রফের দীক্ষা

শ্রীসমরেন্দ্র নারায়ণ বাগচী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১২। ভারতীয় প্রেমিক উড্‌রফ :

অবনীন্দ্রনাথ, হ্যাভেল, কুমারস্বামী প্রভৃতি শিল্পশাস্ত্র ও ভাস্কর্য বিশারদ লইয়া উড্‌রফ কলিকাতা আর্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৯২০ সাল পর্যন্ত সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। ঐ সংস্থাটি প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের একটি বিশেষ আকর্ষণীয় গবেষণা কেন্দ্র হয়।

উড্‌রফের প্রেরণায় ও উদ্যোগে রিউইলের বারলিংটন স্কিমে টোরিয়াসে রাজারামমোহন রায়ের সমাধি স্থানে কলিকাতা আর্ট সোসাইটির পরিকল্পনায় একটি বহুশীর্ষ হিন্দু সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ও সেই মন্দিরের গায়ে রাজার শিষ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বাংলা ভাষায় রাজার প্রশস্তি খোদিত আছে। ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৮৮০ সালে আমি ও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় রাজার স্মরণে ঐ সমাধি মন্দিরে বৈদিক মন্ত্রে তর্পণ করি। সমস্ত রিজেন্টোরিয়াস গ্রাজনে ঐ মন্দিরটি সব দর্শকের দৃষ্টি সর্বদাই আকর্ষণ করে।

লণ্ডন সহরের বিখ্যাত আইন শিক্ষা সংস্থা ইনার টেম্‌পল ভবনে ২৪ ও ২৫শে আগষ্ট ১৯৮০ সালে যাইয়া দোতালায় উঠিবার সিঁড়ির বাঁ দিকের দেওয়ালে দেখিলাম একটি ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি শোভিত, নিচে লেখা আছে—.Mohon Das Karamchand Gandhi—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। আমি ঐ সংস্থার গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে দেখা করিয়া উড্‌রফের আইনী ছাত্রজীবনের তথ্য সংগ্রহ করি। তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া জানি যে, উড্‌রফের বিশেষ উদ্যোগে ও প্রেরণায় মহাত্মাজীর মূর্তি শোভিত হইয়াছে একটি বিখ্যাত ব্রিটিশ আইন শিক্ষা সংস্থায়। উড্‌রফ ও মহাত্মাজী ইনার টেম্‌পল সংস্থায় প্রায় সমসাময়িক ছাত্র ছিলেন।

ভারতের জনগণের পক্ষে উড্‌রফ নীরবে ভারতের দুই যুগোত্তর মহাপুরুষকে সকল দেশবাসীর হইয়া শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাইয়াছেন। ভারতবাসী কেন বিশ্বের জনগণও

আবিল না উড্রফের অন্তরের গভীরে শুদ্ধ ভারত প্রেমের ফল্গুধারার প্রবাহ। ভারত আকাশের প্রদোষ কালের আকাশের সাথী—"রাত্রি", আগরিত ভারত আকাশের মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য—মহাত্মাজী।

'Is India civilized'—"ভারত কি সভ্যদেশ?" গ্রন্থে উড্রফ জগতের কাছে প্রথম প্রকাশ করেন ভারতের অতি সুপ্রাচীন "ভারত ধর্ম" ও তাহার অপূর্ব শিল্পকলা ও তাত্ত্বিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, জাতীয়তাবোধ ও উহার মানবিকতা যাহা পৃথিবীর যে কোন সভ্যতাগর্বী দেশ হইতে বহুতো মহীয়ান। উড্রফ বলেন যে, পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদিগুরু এই ভারত ভূমি।

উড্রফকে ভারত প্রেমিক করিয়াছিলেন তাঁহার গুরু শিবচন্দ্র। তিনি উড্রফকে ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিষয়ে বহু পত্রে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া লিখিতেন। উড্রফের এলিসিয়াম বাস ভবনের গ্রন্থাগারে সভ্যতার সংস্কৃত ভাষায় উড্রফকে লেখা শিবচন্দ্রের পত্ররাজি সযত্নে সুসজ্জিত রহিয়াছে। ১৮৯০ সালে ব্যবহার জীবি উড্রফ আসিলেন কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা করিতে। ক্রমশই তিনি কলিকাতার বহু গুণী, জ্ঞানী, শাস্ত্র বিশারদ ও তত্ত্ব সাধকদের সহিত মিশিতে হইতে লাগিলেন। ফলে তিনি ভারতের ধর্ম, সংস্কার, সভ্যতা সম্বন্ধে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। হইলেন গুরু, পাইলেন হরিদেব ও শিবচন্দ্রকে। শিবচন্দ্র প্রথমেই নির্দেশ দিলেন উড্রফকে ভারত ভ্রমণ করিয়া ভারতের অধ্যাত্ম প্রাণকে জানিতে ও চিনিতে; চিনিতে ভারতের যোগী মহাত্মাদের, গ্রহণ করিতে তাঁহাদের কাছ হইতে ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ। উড্রফ অক্ষরে অক্ষরে শিবচন্দ্রের ঐ নির্দেশ পালন করিলেন। উড্রফ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কটূক্তি—ভারতের কোন ধর্ম নাই, আছে নানা ধর্মের জঞ্জাল—সমালোচনাকালে তাঁহার 'Is India civilized'—'ভারত কি সভ্যদেশ?' গ্রন্থটির উল্লেখ করিয়া একটি উক্তি করিলেন তাঁহার শক্তি ও শাক্ত নামে একটি বিশেষ গ্রন্থে—I have already pointed out in "(In India civilized)" ; that there is a common Indian Religion which I have called Bharat Dharma which is an Aryan Religion (Arya Dharma) held by all Aryan, whether Bramhanic, Buddists or jain. X X – Religion, and there from true civilization, Consists in upholding Dharma as individual and general good and fostering of spiritual progress, so that justice to all to all beings, true happiness, which is the immediate and ultimate end of all humanity and indeed all beings may be attained. Anyone who holds these beliefs follows Bharat Dharma or Common principles of Aryan beliefs.[১৮]

আমার রচিত ভারত কি সভ্য দেশ?" গ্রন্থে বলিয়াছি যে, ভারতে একটি সর্বজনগ্রাহ্য ধর্ম আছে যাহাকে আমি ভারতধর্ম বলিয়া অভিহিত করি। ভারতধর্মই আর্যধর্ম যাহা বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বী আর্যগণ অনুসরণ করে। ধর্ম অথবা সভ্যতার সত্যস্বরূপ হইল সেইরূপ আচরণ যাহা নিজের ও সর্বসাধারণের মঙ্গল প্রসূত আত্ম-তত্ত্ব স্ফুরণে বলীয়ান, ও সর্বলোকের প্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব হীন পরিবেশে সত্য সত্যই সুখ ও শান্তিতে বসবাস। এইরূপ আচরণের আশু ও চরম পরিণতির ফল সকল মানুষেরই কাম্য ও লভ্য। যে জন ঐরূপ সত্য আচরণ পালন করে সেই ভারতধর্ম বা আর্যধর্ম পালন করে"।

ভারত আত্মার অন্তর্লোকে প্রবেশ করিয়া উড্রফ হন ভারতধর্মী ও ভারতপ্রেমিক।

উড্রফ তন্ত্রশাস্ত্র মন্থন করিয়া যে বহু সংখ্যক আকর গ্রন্থগুলি ইংরাজি ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের তন্ত্রশাস্ত্র বিষয়ে এই যুগে

১৮। "শক্তি ও শাক্ত"—উড্রফ, প্রথম অধ্যায় হইতে আংশিক উদ্ধৃত।

প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ; ইহাও তাঁহার ভারতপ্রেম ও গুরুদত্ত প্রাণের অপূর্ব নিদর্শন। বই বিক্রি করিয়া টাকা উপায়ের বাসনা উত্তরককে ঐ মহৎ কার্যে উদ্বুদ্ধ করে নাই।

[দ্রষ্টব্য :—"শক্তি ও শাক্ত" সাতটি ও serpent powers আটটি সংস্করণ ছাপা হয়।]

উত্তরক গুরু শিবচন্দ্রকে গুরু দক্ষিণা অর্পণিবার মানসে হরিদেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বহু মহার্ঘ দান-সামগ্রীর তালিকা করিলেন ও গুরুর কাছে অনুমতি চাহিলেন গুরুদক্ষিণা অর্ঘ দিবার জন্য। শিবচন্দ্র বলেন, "বেশ সাহেব। শক্তি সাধনা করে, তন্ত্রতত্ত্ব ও শাক্তসাধন শাস্ত্ররাশি পাঠ, গবেষণা ও তার যথার্থ মর্মোপলব্ধি ক'রে, ভারতের অতি অবহেলিত কিন্তু অতি সুপ্রাচীন বেদ অনুসৃত ধর্মের ভূমি অন্তর্নিহিত সত্যকে উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছ। মূল সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষায় লেখা আকর তন্ত্রশাস্ত্রাদি তুমি ইংরাজি ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় অনুবাদ, টীকা, টিপ্পনী ও ভাষ্য সংযোগে ভাষান্তরিত ক'রে, এই বিস্মৃত প্রায় শাস্ত্রকে জগতের সামনে প্রকাশ কর। এই কাজই হবে তোমার গুরুদক্ষিণা। তথাস্তু মস্তু।" উত্তরক এরপর এক মূল তন্ত্রশাস্ত্রাদি ইংরাজী, ফরাসী ও জার্মাণ ভাষায় গুরু নির্দেশে ভাষান্তরিত করিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি শিবচন্দ্রের "তন্ত্রতত্ত্ব" বইখানি বাংলা হইতে ইংরাজিতে—"Principles of Tantra" নামে প্রকাশ করিয়া গুরুর চরণে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ নিবেদন করেন। তাঁহার বহু লেখার মধ্যে বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র (আগম) পুরাণাদির যে শাস্ত্র সম্মিত ও যুক্তিপূর্ণ অনন্যসাধারণপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন বহু পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে তাহা এ যুগে অতিনীয়।

(ক্রমশঃ)

—:০:—

সত্যানন্দ তীর্থের সন্ধানে

অরুণা মুখোপাধ্যায়

অ্যাডভোকেট হাইকোর্ট-ডিপ্লোমা—ইন জার্নালিজম

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

এই সুবোধ মহারাজের সন্ন্যাস জীবনের কৃচ্ছ্রসাধনের কথা যা শুনেছি তাঁরই মুখে এখানে সে সব কথা উল্লেখ করছি। তিনি নাকি প্রায় তিন বছর সারা ভারত এমন কি হিমালয় পর্যন্ত দারুণ কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। একদিন তিনি অনাহারে ক্লান্ত হয়ে এত অসুস্থ বোধ করছিলেন যে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন তিনি খাবারের ব্যবস্থা না ক'রে দিলে হিমালয়ের অনকানন্দাতেই প্রাণ বিসর্জন দেবেন। এমন সময় এক হিন্দুস্থানী মৌরকাভিধারী সন্ন্যাসী খাবার নিয়ে এসে তাঁকে দেন ও সেই খাবার গ্রহণ করার পরেই সাধু মূর্তি অন্তর্হিত হন। সুতরাং সুবোধ মহারাজের কীণ সত্তার থাকলেও তিনি যে এতখানি কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন তা সবই ঠাকুরের কৃপায় সম্ভব।

সেদিন মুরাদাবাদ থেকে অরুদের যাবার রাস্তায় দু'পাশে চারিদিকে অসংখ্য ধানক্ষেত ও সবুজ চোখে পড়লো ; কিন্তু ধানক্ষেতের ধান প্রায় বেশির ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে দেখলাম। এসব দৃশ্যে আমাদের দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের কথা মনে হয়ে সকলেই মর্মাহত হলাম। অরুদের যখন পৌঁছলাম তখন চারিদিকে বৈকালভাবের এক

অপূর্ব সমারোহ দেখলাম। চারিদিকে বালির তৃপাকার, দূরে অজয় নদী বয়ে চলেছে, ওপারে অনেক দূরে গাছের জঙ্গলের ঘন কালো রেখা মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়। স্বামিজী গাড়ী থেকে নেবেই নদীর ধারে এক বাঁধানো চত্বরে বসে পেলেন জপের মালা নিয়ে। আমরা মায়েরা এগিয়ে গেলাম আশ্রম দর্শন করতে। আশ্রমের গৌরী মহারাজের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটলো; শান্ত সৌম্য মূর্তি এই সাধু মহারাজকে দেখলেই মন আপনা হতে ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। শুনলাম ঠাকুর গৌরী মহারাজকে প্রথমে দেখেই তাঁর মুখখানি নিজের শ্রীহস্ত দিয়ে তুলে ধরে যেন খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ ক'রে দেখেছিলেন। ঠাকুর হয়তো আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়ে কিছু দেখেছিলেন। আশ্রমের ভেতরে ঢুকে দেখলাম আশ্রমের সামনের দিকের একটি অংশে স্বামী ভূপানন্দ মহারাজ সন্ন্যাসিনী উপোষনা-পুরীর (দেহরক্ষা করেছেন) নামে উৎসর্গ করেছেন। মন্দিরের ভেতরে দেখলাম রামকৃষ্ণের, সারদামায়ের ও আমাদের ঠাকুরের মূর্তি রয়েছে। রামকৃষ্ণের মূর্তিতে কাপড় আলোয়ালো ক'রে পরানো আছে দেখে অপিতা মা আবার ঠিক ক'রে পরিয়ে দিলেন। আমরা সবাই একে একে মূর্তিগুলিতে ফুল দিয়ে পূজো করলাম। এবারে আমরা সারা আশ্রমটি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। আশ্রমের পার্শ্ববর্তী অংশটিতে দেখলাম সুষমাদির মা সন্ন্যাসিনী তপোযোগা পুরীর নামের ফলকে উৎসর্গীকৃত রয়েছে। শুনলাম তিনি পরম ভক্ত বৈষ্ণব সাধিকা ছিলেন ও তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল বৈষ্ণব পীঠস্থানে তাঁর অন্ত কিছু করা হোক ও তাঁর ইচ্ছামত তাঁর অস্থিটুকু সুষমাদি নবদ্বীপের মহাপ্রভুর চিহ্নাঙ্কিত ঘাটে বিসর্জন দিয়েছেন। সুষমাদির মুখে শুনলাম এই পরমভক্ত সন্ন্যাসিনী মা আমাদের ঠাকুরেরও একান্ত ভক্ত ছিলেন ও শুয়ে শুয়েই (আশ্রমে ঠাকুরের বস্ত্রাদি না দেখেই) কোন একজন সন্ন্যাসিনী মাকে বলেছিলেন—"ঠাকুরের কাপড়টি ত' ভাল সুন্দর বেনারসী পরাইস তা চাদর অত মোটা দিইছ কেন?" সন্ন্যাসিনী মা'টি তো অবাক—ঠাকুরের কাপড় আশ্রমে তারা পরিয়ে দিয়েছে—কিন্তু এই মা'টি ঘরে বসে জানতে পারলো কি করে! আবার শুনলাম সুষমাদির মুখে যে দেহরক্ষাকালে এই সন্ন্যাসিনী মা'টি ঠাকুরের উদ্দেশে হাতজোড় করে উর্ধ্বে চেয়ে বলেছিলেন "প্রভু আর কেন! এবার তুলে নাও"। এই সঙ্গে উচ্চারণ মাত্র তাঁর ভ্রূমধ্যে প্রাণ নির্গত হয়। আশ্রমের চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে একটি বিরাট ডালপালা গাছ দেখলাম—চারিদিক শান্ত পরিবেশ—বহু বৈষ্ণবদের সমাধিস্থল দেখলাম। শুনলাম জয়দেবের (রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রধান পার্ষদ ছিলেন) তপস্যার গঙ্গা নিজে চলে এসেছিলেন এখানে ও বছরের একটি সময়ে এখানে খুব বড় মেলা হয়। সুষমাদির মুখে শুনলাম বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেও দেখেছেন যে এই জল প্রকৃত গঙ্গারই জল—কারণ এই জলে পোকা হয় না। আমরা ধীরে ধীরে সেদিন সিঁড়ি বেয়ে বালির মধ্য দিয়ে নদীর চরে এসে দাঁড়ালাম। চারিদিকে সূর্যের উত্তাপ মাখানো বালি, দূরে নদীর রেখা, ওপারে গাছের জঙ্গল মাথার উপর নীলাকাশ—এমন একটা সুন্দর পরিবেশে বৈষ্ণবদের তীর্থক্ষেত্রে সন্ন্যাসিনী মায়েদের সঙ্গলাভ ক'রে পরম আনন্দলাভ করেছিলাম সেদিন। গৌরী মহারাজ আমাদের সঙ্গেই ছিলেন—তিনিই সব ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিলেন—দূরে জঙ্গলের প্রসঙ্গে তিনি বললেন দুর্গাপূজোর সময় ওখান থেকে একটা গমগম্ ক'রে ঢাকের বাজনার আওয়াজ আসে—কিন্তু ওটা যে কোথাকার আওয়াজ তা কেউ সঠিক বলতে পারে না। বালির মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নানা কথা প্রসঙ্গ গৌরী মহারাজের সঙ্গে আমাদের হচ্ছিল; সিঁড়ির উপর দিয়ে উঠতে ঘুরে দেখলাম সেই বাঁধানো চত্বরে গাছের তলায় স্বামী ভূপানন্দ মহারাজ একমনে মালা জপ ক'রে যাচ্ছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল তিনি এই শান্ত পরিবেশের মধ্যেও আরো শান্ত পরিবেশ নির্বাচন করেছেন। তাই আমাদের কোলাহল তাঁকে স্পর্শ করেনি। আশ্রমের কাছাকাছি দেখলাম আশ্রমের সামনে বহু হতভাগ্য দরিদ্রসন্তান থালা বা পাতা নিয়ে বসে আছে ওদের একমাত্র খাদ্য সোয়াবিনের অপেক্ষায়। শুনলাম এই সোয়াবিন প্রতিদিন অসংখ্য ছেলেমেয়েকে দেওয়া হয়; সবই ঠাকুরের কৃপা আর কি। সেদিন আশ্রমের ভেতরে

একটি ছোট ছেলের বাউলগান আর নাচ আমাদের সকলের মন আকৃষ্ট করেছিল। গানের শেষে আমরা ও স্বামিজী ছেলেটিকে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান ক'রে ঠাকুরের কৃপা লাভ করলাম। এই সময় ১৫ বৎসরের বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী অন্নদা একখাল হেসে আমাদের জন্য মুড়ি, মাখন, রসগোল্লা, ভোগের প্রসাদী তরকারী ও চা তৈরী ক'রে নিয়ে এলেন, বৈষ্ণবভক্তদের পরম পীঠস্থানে বসে এবম্বিধ প্রসাদ পেয়ে সমস্ত মনটাতে অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠেছিল। গৌরী মহারাজ ও অন্ন মা'র ইচ্ছে হয়েছিল আমাদের অন্নপ্রসাদ সেদিন খেয়ে যাবার জন্য; কিন্তু আমরা রাজী হতে পারিনি। কারণ একটা সময় এখানে কাটিয়ে গেলে কিছু অসুবিধেও হয়তো আমাদের হতে পারে এই আশঙ্কায়। যাহোক সেদিন গৌরী মহারাজের আশ্রমের সংস্কার ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এবার ফেরার পালা। তাই সেদিন গৌরী মহারাজ ও অন্ন মা'কে প্রণাম ক'রে ও ওঁদের আতিথেয়তার প্রশংসা জানিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। সঙ্গে দেখলাম গৌরী মহারাজও উঠেছেন। গাড়ী ছাড়ল। অল্প একটু এগোতেই গাড়ীর গতি কমে এল। গৌরী মহারাজ ও সন্তোষ মহারাজ জানালেন এখানে আমাদের নামতে হবে। মহাপ্রভুর মন্দির দর্শন এখানে আমরা করবো। অনেক বেলা হয়ে গেছে বলে আমরা ভাবলাম এখনি যাব কি যাব না। গাড়ীর ছাড়ি কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল; ড্রাইভার বললো একটু ঠেলতে হবে; তবে ছাড়ি হবে। আমরা তখন সমস্বরে বলে উঠলাম—"আমাদের ভাগ্যে দর্শন করতে নামতেই হবে; মহাপ্রভুকে ডিঙিয়ে যাওয়া হবে না এটাই মহাপ্রভু দেখালেন। আমরা একে একে নামলাম। কিন্তু একি! চোখ যে ফেরানো যায় না। আমাদের চোখের সামনে অপূর্ব ভাস্কর্য মণ্ডিত চূড়াবিশিষ্ট মহাপ্রভুর বিরাট মন্দির। এটি প্রায় 600 বছরের হবে; জয়দেবের নিজেরই বাড়ী এটি; পরবর্তীকালে সংস্কার ক'রে মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে। সেদিন মনে হয়েছিলো শুধু বৈষ্ণবদের পীঠস্থানই নয়—এটি ঐতিহাসিকদের গবেষণার বস্তুও যেমন বটে, তথ্যও তেমনি। মন্দিরের ভেতর জয়দেব ও পদ্মাবতীর মূর্তি দর্শন করলাম। জয়দেবের লেখা "গীতগোবিন্দ" পুঁথিখানি জর্জরিত অবস্থায় দর্শন করলাম ও মাথাতেও স্পর্শ করলাম। তুলসী চরণামৃত দিচ্ছিলেন গৌরী মহারাজ; সবাই আমরা খেলাম; কিন্তু ওখানেও একটু রসিকতা করলেন যুধমাদি। গৌরী মহারাজের হাতে তুলসীপাতা উঠতে একটু দেরী দেখে যুধমাদি বললেন—"ভক্তি নাই তো তুলসী উঠবে কি করে?" আমরা সবাই হেসে উঠলাম। এবারে মন্দির থেকে বেরিয়ে আমরা সবাই নদীর ধারে শিবমন্দির গুলিতে প্রণাম করলাম ও সেখানে একটি ক্ষুদ্র পাথর (পদ্মের পাপড়ির একাংশ) দর্শন করলাম। এটিতে শুনলাম মহাপ্রভু তপস্যা করেছিলেন ও এটি নদীতে ভেসে যায়। তারই একাংশ এই পাথরটি। আমরা সবাই মিলে প্রণাম করলাম।

(ক্রমশঃ)

"নাম ক'রে যাও, ঠাকুরকে ডেকে যাও, পরে দেখবে কৃপা কাকে বলে। ব্যবসা করতে হ'লে, চাকরি করতে হলে কিছুদিন এমনি খাটতে হয়, তারপর লাভের কথা—শ্রীঠাকুর বলেছেন—"নাম কর আর সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা কর যাতে ঈশ্বরেতে অনুরাগ হয়।"

—শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ

ভুল করেছি

(স্বামী সত্যানন্দদেবের বাণীর অনুভাবে)

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

ভুল করেছি, ভুল করেছি
জীবনটারে ভালবেসে,
কত না ছল আমার সাথে
করে কেবল কাছে এসে।
অন্ধ সে যে পথ জানে না,
কারো বারণ সে মানে না,
মরীচিকার পাছে ছোটে—
নিয়ে চলে নিরুদ্দেশে।
ভুল করেছি, ভুল করেছি
জীবনটারে ভালবেসে।

চ'লে চ'লে ক্লান্ত আমি—
আঁধার হেরি চারিধারে,
লক্ষ্য রে হায়, পাই না খুঁজে,
ডুবন্ত কাঁদে হাহাকারে।
জীবন-গতি বড় কুটিল,
মনের সাথে হয়নাকো মিল,
এতদিন ত' বুঝিনিকো,
সে যে ধারুণ সর্বনেশে।
ভুল করেছি, ভুল করেছি,
জীবনটারে ভালবেসে।

এখন আমি কোন্ পথে যাই,
হ'লাম শুধু দিশেহারা,
নাইকো সাথী, নাইকো দোসর,
সবই দেখি আজি-পারা।
তুমি এখন, এস মরণ,
বাঁচি আমি তোমার শরণ,
আমার ব্যথা-বেদন মাঝে
এস তুমি বঁধুর বেশে।
ভুল করেছি, ভুল করেছি
জীবনটারে ভালবেসে।

কঠিন নিঠুর হও না তুমি,
পরদী মোর তুমিই হ'বে,
জীবনেরে চালাও তুমি
তরাল-জীবন-ছিন্ন-রবে।
এবার তুমি বাজাও বিষাণ,
ওড়াও তোমার রক্ত-নিশান,
জীবন-গতি রুদ্ধ ক'র—
দীপ্তি তোমার উঠুক হেসে।
ভুল করেছি, ভুল করেছি,
জীবনটারে ভালবেসে।

দেখাও তোমার মুক্ত তোরণ,
চিত্ত ত'র আশার পাশে,
ফেরাও এবার জীবনটারে
নবীন সূর্যোদয়ের পাশে।
আঁধার তোমার হ'ক না কালো,
তারই মাঝে আছে আলো,
দীপ্তি তোমার জ্বালো জ্বালো
মোর জীবনের অবশেষে।
ভুল করেছি, ভুল করেছি,
জীবনটারে ভালবেসে।

শ্রীগুরুদেবাদিমঙ্গলশাসনম্

স্বামী নচিকেতসানন্দ

কিছুদিন আগে জয়রামবাটি ও কামারপুকুর যাবার সৌভাগ্য হ'য়েছিল। আগেও অনেকবার গেছি কিন্তু কখনও রাত্রিবাস করি নি। এবার কামারপুকুরে রাত্রিবাস করবার সুযোগ ঘটল শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায়। ওখানে রাত্রি চারটার মঙ্গলারতির সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে মঙ্গলশাসন স্তব গান ক'রে শোনানো হল। বড় ভাল লাগল। দক্ষিণ ভারতে মঙ্গলারতির সময় এই রকম মঙ্গলশাসন স্তব পাঠ করা হয়, জানি। উত্তর ভারতে এই প্রথম দেখলাম। মঙ্গলশাসনম্ এর অর্থ মঙ্গলপ্রার্থনা। আমরা সাধারণতঃ নিজের মঙ্গল, প্রিয়জনদের মঙ্গলই প্রার্থনা ক'রে থাকি ইষ্টের কাছে। ইষ্ট যখন প্রিয়তম হন, তখন ভক্তের ইচ্ছা করে তাঁর ভক্তও মঙ্গল প্রার্থনা করি। এই মনোভাব থেকেই মঙ্গলারতির সময় মঙ্গল প্রার্থনা করা বা মঙ্গল-শাসনম্ পাঠ বা গান করা হয়।

মঙ্গলারতির প্রচলন যা যশোদা করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। ভোরবেলায় অন্ধকার থাকতে উঠে প্রথমেই গোপালের চাঁদ মুখটি দেখতে ইচ্ছা করত। তাই প্রদীপ জেলে মুখটি দেখতেন। চাঁদ মুখে চুমো খেতেন আর অন্ধকারে আলো জ্বাললে পোকামাকড়ও সব পালাত। তাতে গোপালের মঙ্গলও হ'ত। এই ভাবে মঙ্গলারতির প্রচলন হল বলে অনেকে মনে করেন। তারপর তার সঙ্গে যুক্ত হল মঙ্গলশাসনম্ বা মঙ্গল প্রার্থনা। শাসনম্ কথার অর্থ দমনে রাখা। অন্যায়কে বাড়তে না দেওয়া। তা থেকে দানপত্রকেও শাসনপত্র বলা হত। কারণ এই দুধও অন্যকে দেওয়া হল। অন্যেরা যাতে সেখানে আসতে না পারে এই আজ্ঞাপত্র। তা থেকে এল মঙ্গলশাসনম্, মঙ্গল প্রার্থনা করা। অমঙ্গলকে ঠেকিয়ে রাখা। যাই হোক, ভাবটি ভালো লাগায় প্রত্যহ ভোরবেলায় উঠে ঠাকুরকে তোলবার সময় ঐ মঙ্গলশাসনটি পাঠ করি। পুজোর আগে যখন কাশী থেকে আসছি, ট্রেনের মধ্যে হঠাৎ মনে হল আমাদের ঠাকুরকে নিয়ে এই রকম মঙ্গলশাসনম্ রচনা করলে কেমন হয়? শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় লেখা হয়ে গেল। সেই লেখাটি যথাযথ ভক্তদের কাছে উপহার দিচ্ছি। এতে সুর দিয়ে ভোরবেলায় গান করলে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসন্ন হবেন সন্দেহ নেই। যিনি স্বয়ং মঙ্গলময় তাঁর জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করা নিরর্থক হলেও ভক্ত ভগবানকে ছোট ক'রে দেখে বলেই এই মঙ্গল-প্রার্থনা। সুতরাং তাঁর মঙ্গল হোক না হোক সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু এটি নিত্য পাঠে আমাদের যে কল্যাণ হবেই, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই ভবটি অনুষ্টুপ ছন্দে লেখা হয়েছে। অনুষ্টুপের লক্ষণ—

পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ।
ষষ্ঠং গুরু বিজানীয়াদেতল্লক্ষণমিরয়ো মতঃ॥

অর্থাৎ এই ছন্দের চারি চরণের প্রত্যেক চরণে আটটি ক'রে বরবর্ণ থাকবে। তার মধ্যে প্রতি চরণের পঞ্চম বরবর্ণ লঘু হবে এবং ষষ্ঠ বরবর্ণ গুরু হবে। আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের সপ্তম বরবর্ণ লঘু হবে। অন্য বরবর্ণ সম্বন্ধে কোনও বাঁধাবাঁধা নিয়ম নেই। ছন্দোমঞ্জরীকার প্রতিটি ছন্দের নিয়মও সেই ছন্দে লিখে গেছেন। সুতরাং অনুষ্টুপ ছন্দের নিয়মটিও অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত। এখানে চারটি চরণের চারটি পঞ্চম বরবর্ণ যথাক্রমে "মু" "চ" "বি" ও "ন" লঘু হয়েছে। প্রতি চরণের ষষ্ঠ বরবর্ণ যথাক্রমে "ল" ও "ভু" গুরু হয়েছে পরে সংযুক্ত বর্ণ "র্ধ" ও "র্ধ" থাকায় এবং "আ" "মো" নিজেরাই গুরু। আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের সপ্তম বর্ণ যথাক্রমে "র্ধ" ও "ন" লঘু।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় রচিত এই "শ্রীগুরুদেবাদিমঙ্গল-শাসনম্"-এও সর্বত্র এই নিয়ম মেনে রচনা করা হয়েছে।

শ্রীগুরুদেবাদিমঙ্গল-শাসনম্

মঙ্গলং রামকৃষ্ণায় কুদিরামসুতায়ে।

অবতারবরিষ্ঠায় তস্মৈ ভবতু মঙ্গলম্ ॥ ১ ॥

কুদিরামের পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণের মঙ্গল হোক, যিনি অবতারশ্রেষ্ঠ তাঁর মঙ্গল হোক।

জগদ্ধাত্ররূপিণ্যৈ দেব্যৈ ভবতু মঙ্গলম্।

পরা-প্রকৃতি-রূপায়ৈ সারদায়ৈ চ মঙ্গলম্ ॥ ২ ॥

জগতের মাতৃস্বরূপা দেবীর মঙ্গল হোক্। পরা-প্রকৃতিরূপা শ্রীসারদার মঙ্গল হোক।

গর্জয়েদান্তসিংহায় বিবেকানন্দরূপিণে।

শিবাবতারভূতায় তস্মৈ ভবতু মঙ্গলম্ ॥ ৩ ॥

বিবেকানন্দরূপী গর্জনশীল বেদান্তসিংহ, যিনি শিবের অবতার তাঁর মঙ্গল হোক।

কালীপ্রসাদনাম্নে বৈ কালীতারাসুতায় চ।

অভেদানন্দ-নামিনে সদা ভবতু মঙ্গলম্ ॥ ৪ ॥

যাঁর নাম ছিল কালীপ্রসাদ, যিনি কালীতারার পুত্র, সেই যোগী অভেদানন্দের সর্বদা মঙ্গল হোক।

মহেন্দ্রনাথ-পূজ্যায় সত্যব্রতায় ধীমতে।

কাশীশ্বরীসুতায় চ সত্যানন্দায় মঙ্গলম্ ॥ ৫ ॥

মহেন্দ্রনাথের পূজ্য ধীমান্ সত্যব্রতের মঙ্গল হোক। কাশীশ্বরীপুত্র সত্যানন্দের মঙ্গল হোক।

প্রভাকরপ্রমুখৈশ্চ নিত্যপূজ্যপদায় চ।

(নির্বেদানন্দসচ্ছিষ্যগণপূজ্যপদায় চ।)

সত্যানন্দায় দেবায় সদা ভবতু মঙ্গলম্ ॥ ৬ ॥

প্রভাকর প্রমুখ (নির্বেদানন্দ প্রমুখ সব শিষ্যগণ) কর্তৃক যাঁর পদযুগল নিত্য পূজনীয় সেই সত্যানন্দ দেবের সর্বদা মঙ্গল হোক।

অর্চনাস্মরণাদ্যভিক্তাচিতপদায় চ।

মাতৃপূজা—বিধিষ্টায় সত্যানন্দায় মঙ্গলম্ ॥ ৭ ॥

অর্চনা, স্মরণা, আরতি প্রভৃতি ভক্তাগণ কর্তৃক যাঁর পদ-যুগল পূজিত হ'ত, মাতৃপূজায় বিধিষ্ট সেই সত্যানন্দের মঙ্গল হোক।

রামানন্দপ্রভবে চারুণে তু জাহ্নবীতটে।

সেবায়তনবাসিনে তস্মৈ ভবতু মঙ্গলম্ ॥ ৮ ॥

রামানন্দপ্রভু গঙ্গাতটবর্তী আশ্রম সেবায়তনে যিনি বাস করেন, তাঁর মঙ্গল হোক।

যস্য "তাব মুখে" পত্রং জ্ঞান-ভক্তি—প্রদায়কম্।

তস্মৈ বিজ্ঞান-ধীরায় সত্যানন্দায় মঙ্গলম্ ॥ ৯ ॥

যা'র তাবমুখে পত্রিকা জ্ঞান ও ভক্তি প্রদান করে, যিনি বিজ্ঞানে প্রবীণ সেই সত্যানন্দের মঙ্গল হোক। এখানে বিজ্ঞান কথার দুইটি অর্থ। বাংলায় বিজ্ঞান মানে science. আমাদের ঠাকুর যে ধর্মজগতে science নিয়ে কত পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে গেছেন, সে তো আমরা সকলেই জানি। আর প্রবীণ ঠাকুর ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব বিজ্ঞানের মানে করেছেন, যা'র সঙ্গে ভগবানের একাত্মতা হয়েছে, তিনি বিজ্ঞানী। যে দুধ কি তা জানে, তার জ্ঞান হয়েছে, যিনি দুধ খেয়ে তুষ্টপুষ্ট হন, তিনি বিজ্ঞানী। (কথামৃত)

ভক্তজন-সুখায় চ ভক্তজন—হিতায় বৈ।

যস্যাশীর্বাদ এব বৈ কামং তস্মৈ চ মঙ্গলম্ ॥ ১০ ॥

ভক্তজনের সুখের জন্য, ভক্তদের হিতের জন্য যাঁর আশীর্বাদই যথেষ্ট, তাঁর মঙ্গল হোক। (কামম্—যথেষ্ট, প্রচুর। আমরা আগে সুখ চাই, হিত চাই পরে, জ্ঞান হবার পর। কারণ হিত চাইলে যে সব সময় সুখ হবে, তা নয়। সেই জন্য স্তবে আগে "সুখ" ও পরে "হিত" দেওয়া হল)।

গিরিশৈরিকবাসায় জ্যোতির্ময়ায় দেহিনে।

নিত্যানন্দায় দেবায় সত্যানন্দায় মঙ্গলম্ ॥ ১১ ॥

যিনি গিরি-গৈরিক-বাস-মণ্ডিত যিনি জ্যোতির্ময় দেহধারী, যিনি নিত্যানন্দময়, সেই সত্যানন্দ দেবের মঙ্গল হোক।

করুণামৃত—বিগ্রহরূপায় নিত্যসাধবে।

প্রেমামৃত-স্বরূপায় সত্যানন্দায় মঙ্গলম্ ॥ ১২ ॥

করুণা যাঁর বিগ্রহ মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে আছেন, যিনি নিত্য সাধু, যিনি প্রেমামৃতস্বরূপ, সেই সত্যানন্দের মঙ্গল হোক।

(এই দুটি স্তবে আমাদের ঠাকুরের প্রণাম মন্ত্রটি : গিরি-গৈরিক-মণ্ডিতং নিত্যানন্দমূর্তিম্। করুণাবতারং

প্রেমপূরুষং সত্যানন্দরূপং নিত্যং নমামঃ। এই মন্ত্রটি অনুষ্টুপ্ ছন্দে রাখা হল)।

ত্রিনয়নী-গদাধর-গোপালাবিষ্ট-চেতসে।

সমাধিস্থ-সত্যানন্দ-রামকৃষ্ণায় মঙ্গলম্ ॥ ১৩ ॥

ত্রিনয়নী গদাধর গোপালে যাঁর চিত্ত আবিষ্ট হয়ে আছে, সেই সমাধিস্থ সত্যানন্দরূপী রামকৃষ্ণের মঙ্গল হোক।

সারদাপরবিশ্লেষতুষ্ণীং চিৎস্বরূপিণে।

রামকৃষ্ণস্বরূপায় সত্যানন্দায় মঙ্গলম্ ॥ ১৪ ॥

যিনি সারদা মার অপর একটি মূর্তি, তিনি চিৎ স্বরূপ, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ, সেই সত্যানন্দদেবের মঙ্গল হোক।

যস্যকৃপাকটাক্ষেণ ব্রহ্মজ্ঞানিক আয়তে।

পরব্রহ্মস্বরূপায় সত্যানন্দায় মঙ্গলম্ ॥ ১৫ ॥

যাঁর কৃপা কটাক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, যিনি পরব্রহ্ম স্বরূপ, সেই সত্যানন্দের মঙ্গল হোক। (এ দীন সেবক শ্রীশ্রীঠাকুরকে, স্বয়ং ব্রহ্ম বলে আছেন এরূপ ভাবে অনেক-বার অনুভব করেছেন)।

সমাধৌ সহজে সদা স্থিতায় পরমাত্মনে।

কালিকালাপতুষ্টায় সত্যানন্দায় মঙ্গলম্ ॥ ১৬ ॥

যিনি সর্বদা সহজ সমাধিতে থাকতেন, যিনি পরমাত্মস্বরূপ, যিনি কালীর সঙ্গে কথা বলে তুষ্ট হতেন, সেই সত্যানন্দের মঙ্গল হোক। (সহজ সমাধি—সমাধি যাঁর সহজাত ছিল। আমরা অনেকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রবীণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণরূপে দেখেছি। স্বামীপাদ অভেদানন্দ প্রবীণ ঠাকুরের স্তবে তাঁকে "যুক্ত-সহজ-সমাধিং" বলে স্তব করেছেন। সুতরাং সেদিক থেকে বিচার করলে আমাদের ঠাকুরও সহজ সমাধিতে থাকতেন, এ কথা বলায় কোনও অত্যুক্তি হয় না। তা ছাড়া যাঁর মধ্যে আমরা গদাধর গোপালজীকে দেখেছি, সারদা মাকে দেখেছি, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছি, তিনি যে জন্ম থেকেই ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাধিস্থ অবস্থায় থাকতেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই)।

ইচ্ছা-মাত্রেণ যস্য বৈ সোমসূর্য-চরাচরাঃ।

চলন্তি চ প্রবর্তন্তি তস্মৈ তস্মৈ মঙ্গলম্ ॥ ১৭ ॥

যাঁর ইচ্ছা মাত্রই চন্দ্র সূর্য চরাচর সব চলে ফেরে, আবর্তিত হয়, সেই সত্যানন্দদেবের মঙ্গল হোক।

(আমেরিকা থাকাকালীন এই দীন সেবকের একটি দর্শন হয় যে শ্রীঠাকুর সেখানগরে, গঙ্গার ঘাটে বসে আছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সূতোটি ওঁর হাতে। ওঁর ইচ্ছায় চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র সব কাজ করে চলেছে)।

মঙ্গল গুরুদেবায় রামকৃষ্ণায় মঙ্গলম্।

দেব্যৈ মাত্রে চ শুভেভ্যঃ সর্বলোকায় মঙ্গলম্ ॥১৮॥

গুরুদেবের মঙ্গল হোক। শ্রীরামকৃষ্ণের মঙ্গল হোক। মাতা শ্রীসারদা দেবীর, শুভদের ও সর্ব লোকের মঙ্গল হোক।

সত্যানন্দ সত্যানন্দ সত্যানন্দায় মঙ্গলম্।

রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণায় মঙ্গলম্ ॥ ১৯ ॥

হে সত্যানন্দ, হে সত্যানন্দ, সত্যানন্দের মঙ্গল হোক। হে রামকৃষ্ণ, হে রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণের মঙ্গল হোক। (এখন মঙ্গল হোক যে প্রার্থনা করছি, কার কাছে? মঙ্গল করবার ক্ষমতা কার? ক্ষমতা সেই শ্রীরামকৃষ্ণের, সেই শ্রীসত্যানন্দের, তাই বলা হল, হে সত্যানন্দ, তোমার কাছে প্রার্থনা করছি তোমার মঙ্গল হোক)। মঙ্গল শান্তিমন্ত্র সমাপ্তম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসত্যানন্দার্পণমস্তু।

মঙ্গল শান্তি শেষ হল, সকলে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিবিধ শান্তি লাভ করুন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সত্যানন্দ রচিত ত্রিশিস তাঁকেই অর্পণ করা হল।

—:০:—

গান

শ্রীলোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমায় যদি ভুলি ঠাকুর
তুমি আমায় ভুলোনাক
দূরে যদি পালাই কভু
তুমি প্রভু সাথেই থেক।...
শিশুকালে কাছে ছিলে
এখন কেন দূরে গেলে
দেখা না হয় নাই বা দিলে
হৃদয় মাঝারে থেক।...
কামিনী আর কাঞ্চনেতে
মন যে আমার উঠলো মেতে
তাই কি ওগো প্রেমের ঠাকুর
আমায় তুমি দূরে রাখ?
কেমন ক'রে বলবো ঠাকুর
পড়বো না আর মায়াজালে,
তুমি না বলালে প্রভু
বলে কি কেউ কোন কালে?
এবার ঠাকুর বলাও মোরে
জড়াবো না আর মায়াডোরে
ধূলা বেড়ে কৃপা ক'রে
হৃদয় মন্দিরে থেক।...

নব বৈশাখ

নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আর একটি বছর অতি ক্লান্ত গেলো চলে
নব বৈশাখ এলো চৈত্রকে দিতে ফেলে।
প্রখর সূর্যের আলোকে আকাশ পূর্ণ
কদম্ব ছানির যবনিকা দেখা দীর্ণ।
যাদের কল্যাণ-পথে বিচরণের অভিলাষ
তাদের তাপস বৈশাখ দেয় এই আশ্বাস—
বিরাটের আরাধিতে জীবনের ধূপ জেলে
সৃষ্টির বহন লীলায় স্বেচ্ছায় যোগ দিলে
আনন্দেরই উদয় হয় দুঃখের ফলে।
যদি সর্বানীত্রির কর্মাণি প্রাণ কর্মাণি চাপরে
আজ সংযম যোগাগ্নে সাও আহুতি করে
তখন ভাবের উজ্জ্বল দীপিতে
ক্ষুদ্র স্বার্থ যায় দৃষ্টি হতে সরে।
ব্রহ্মার্পণের ফলে
পুঞ্জীভূত দুঃখ যায় ক্ষমার মাঝে মিলে।
ভূমৈব সুখম্—
ক্ষমার সরল প্রসাদে দুঃখ তাই আনন্দ-রূপ ধরে।
যৎ সর্বজ্ঞো তাপসং সাধু মম কভু নাহি লয়
সেই প্রভুর প্রসাদ লাভ করি ক্ষমা
যেন জীবন ধন্য হয়।

পঁচিশে বৈশাখ এক রূপালী আলোক

সন্তোষ কুমার অধিকারী

পার হয়ে যাই এক ব্যর্থতার ধাবমান নদী
দু'পার তালের ছায়া,
যেন আশা ছোঁয় দিগন্তকে ;
হেঁটে হেঁটে রক্তাক্ত পায়ের
ক্লান্তির ধূলিতে দু'পা ভরাই কেবল।

লাল মাটি, ঘোড়াই, প্রান্তর,
আমি শুধু পার হয়ে যাই—
পড়ে থাকে শুধু এক মৃতস্তার অসীম আঁধার।

সময়কে শুধু মাঝে মাঝে
চেনা মনে হয়।
অন্ধকারে কোন এক দীপশিখা স্থির হ'য়ে জ্বলে
স্রোতের আবর্ত থেকে অন্তহীন অনুরোধ
পার হয়ে গিয়ে
কোন এক দীপের নগরে
মাঝে মাঝে চোখ পড়ে যায়।

আমি স্থির নয় জলস্রোতে,
বাধা নেই পার হতে সময়ের পথ।
জীবনের মৃতস্তাকে ভরে দিতে অন্তহীন
চলার প্রবাহে
কোথাও অস্পৃষ্ট কিছু নেই।
শূন্য বলে মনে হয় যাকে
সেই পূর্ণ হ'য়ে ওঠে একটি বিস্ময় চারদিকে
চিহ্নিত সে আলো থেকে অযোধ সময়ে
নিরন্ত প্রবাহ হ'য়ে বয়ে যেতে পারি,
হতাশার রক্ত ঠেলে ঠেলে
স্থিরার কুয়াশা ছিঁড়ে ফেলে
বয়ে যেতে পারি এক রূপালি আলোকে দেখা
অসীম প্রত্যয়ে।

স্মৃতি কৌমুদী

৺বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য
ডি. লিট. আই. এ. এস

প্রকৃতি দুলাল তুমি—প্রকৃত জনের প্রিয় সখা
পল্লীকে করিলে তীর্থ ; যাদুস্রোত অজয়ের তীরে
তুলসীর বনে বসি বিছা ভাসি নয়নের নীরে
বাজালে মোহন বেণু-ধরনীরে করিয়া অলকা।
গ্রামের যতেক চাষী—কেহ দুঃখী, কেহ মূর্খ লোক।
সবারে দেখালে তুমি, প্রেমতাপে হয়ে যায় হীরে
কঠিন হৃদয়ও গলি ; অলক্ষিতে শুধু ধীরে ধীরে
ভক্তের সাধুর রূপ ধরে—যাহা নয় কভু মেকি।
প্রাচী তথা প্রতীচীর বিজ্ঞান ও কাব্যের বিভূতি
তোমার মননশীল অন্তরে করিল উদ্ভাসিত ;
কিন্তু এহো বাহ্য, কবি, তোমার বৈষ্ণব বিত্ত কাছে ?
সত্য শিব সুন্দরের লাগি তব উৎসুক আকুতি
সৃজনী লেখনীধারে নানা বর্ণে হ'লো প্রস্ফুটিত ;
প্রবীণের প্রাণে মুগ্ধ চিরশিশু হর্ষ ভরে নাচে ॥

---

* কবি কুমুদরঞ্জনের উদ্দেশে রচিত। শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিকের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

—:০:—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠ-চক্র

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ী

প্রতিবেদক—ভৈরবনাথ থাগ

[ভূমিকা : পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ দেব গুরুদের কাছে সব সময় সমবেত নাম, প্রার্থনা, হোম, পাঠ প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপর বিশেষ জোর দিতেন। তাঁর সেই আদর্শকে ভিত্তি করেই সিউড়ী, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের গুরুকুলের এই রবিবাসরীয় আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল। এ পত্রাবলীই সত্য পূজা। শ্রীশ্রীঠাকুর, মাকিজী, শ্রীশ্রীমা, আমাদের ঠাকুর (শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ দেব) প্রমুখ দেব-মানব ও মানবদের কথাই নিবেদন করেন তাঁদের সন্তানরূপ। আশ্রমের অন্যতম গুরু শ্রীচৈতন্য চন্দ্র খাগ সিকন করছেন সেই পবিত্র গঙ্গাধারা…প্রতি মাসেই মাসাবাহিকভাবে পাঠচক্রের বিবরণী প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে। তবে সর্বোপরি শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাই এ ব্যাপারে একমাত্র সহায়। —সম্পাদক 'চাবমুখে'।]

প্রথম অধিবেশনের সারাংশ : ১৫ই মার্চ, ১৯৮৩, বুধবার—১লা চৈত্র, ১৩৮৯ শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা। ধূপ ও ফুলের গন্ধে 'ম' 'ম' করছে মন্দির প্রাঙ্গণ। তারপর ঘরে উঠেছে হোমাগ্নি শিখা। গুরুদেবের সমবেত প্রার্থনা সংগীত আর সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের পূত মন্ত্রোচ্চারণে রচিত হয়েছে ধর্মীয় পরিবেশ। মনে হচ্ছে শ্রীঠাকুর আগের মতোই মন্দির দরজার পূর্বাস্য হয়ে বসে আছেন তাঁর আসনটিতে, সেই পরিচিত ভঙ্গীতে ; প্রশান্ত আননে মধুর হাসি। তাঁর দিবা ইঙ্গিতেই বুঝি সত্যেনদা (শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়) পাঠচক্র পুনরায় শুরু করার প্রস্তাব রাখলেন। ঐদিনই পাঠচক্রের শুভ উদ্বোধন করলেন সুহাসদা (স্বামী সুবেন্দ্রানন্দ)। প্রতি রবিবার সন্ধ্যা পাঁচটায় শুরু হল নিয়মিত পাঠ ও আলোচনা। এর মধ্যে হীরুদার (স্বামী মহানন্দ) দিব্যানুভূতি হোল 'শ্রীঠাকুর' কল্পতরুর বৃষ্টি মেলে বসে আছেন পাঠচক্রের আসরে।' মায়ের আকর্ষণে মেয়ে এসেছেন নানী।

প্রথম মন্ত্রম্ পাঠ করলেন সুহাসদা। "শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের হাতে ভক্তদের জলসিক্ত মাথা মুছিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর কি তখন মনে পড়ছিল সেই সব পুরাণো দিনের কথা আবার, সোহাগে ঠাকুর যখন তাঁদের বুক আগলে রাখতেন। ঠাকুর তাঁর সেবা করবার অধিকার দিয়েছিলেন তাঁদেরই যাঁরা সে হাত সংসারের কাজে লাগাবেন না বলে প্রতিজ্ঞাটি দিলেন। এক অসতর্ক মুহূর্তে লীলাময় ঠাকুর স্বীকার ক'রে ফেললেন তাঁকে আবার আসতে হবে। বললেন, 'যানদর্শন, কৃপাদর্শন সবই সত্য। সন্তানদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যান সহায়ক সূক্ষ্ম যন্ত্রের উদ্ভাবন করলেন। শিক্ষা দিলেন 'জোর ভাইব্রেশনসালে' পড়তিতে ধ্যান করার।

বিমলদা (স্বামী বিমলানন্দ) উপনিষদের বাণী ব্যাখ্যা করলেন। জোর করতে হবে ভাবের মাধ্যমে। ব্রহ্ম 'স' মন, 'সা' মন, তিনি 'তৎ'। অতীত চিন্তার প্রজ্ঞা মানুষকে 'বর্তমানে' পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু আমরা কি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাচ্ছি ? আমরা যখনই অন্ধকার করি আমাদের অন্তরাত্মা ক্ষুব্ধ হয় তখনমাত্র এটুকুই বলা যায়। ব্রহ্ম প্রাণেরও প্রাণ। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না। তিনি সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ মনের গোচর। বিবেকী পুরুষ ইন্দ্রিয়কে সংযত ক'রে অন্তরে তাঁকে দর্শন করেন। তপস্যা, 'দম' ও কর্মের মাধ্যমে তাঁকে লাভ করতে হয়। তাঁর বিলাস লীলাকাশে। আধ্যাত্মিক স্তরে যা ঘটে মানসিক ও ব্যবহারিক জগতেও পরে তাইই ঘটে।

বনতলায় (শ্রীবনত কুমার দে) কথামৃত পাঠকালীন বারে বারেই আমাদের ঠাকুরের কথা এসে পড়ছিল। ঠাকুর বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার বরিষ্ঠায়। তিনি জগতে পূজিত হচ্ছেন এটাই তো তাঁর অবতার তত্ত্বের প্রমাণ। তাঁকে প্রথম দেখতে এসেই শ্রীম'র মনে হয়েছিল বৈষ্ণবদেবের কথা। দ্বিতীয় দর্শনে তিনি দেখলেন কেশবের কল্যাণ কামনায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর চিন্তি মানত করছেন মা জগদম্বারিণীর কাছে। ব্রহ্মবিৎ পরম-হংসের কাছে ব্রহ্মই কালী ; কালীই ব্রহ্ম। তৃতীয় দর্শনে শ্রীম'র অহঙ্কার চূর্ণ। তিনি দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব জ্ঞানের খনি। শিখলেন, ঈশ্বরই সব আর সব অসৎ। তাঁর অস্তিত্ব সর্বভূতে। জানলেন তাঁকে লাভ করতে হলে চাই নির্জনতা, ব্যাকুলতা, সাধুসঙ্গ ও ঈশ্বর বিশ্বাস। শ্রীম'র উপলব্ধি হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণ পরমপুরুষ। তাই চতুর্থ দর্শনে তিনি দাক্ষাৎ প্রণিপাতে নিজেকে নিবেদন করলেন। "যুগে যুগে বার আসা" পাঠ ক'রে চললেন সত্যানন্দা। তিনি আলোচনা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব মানবলীল' ; তাঁদের রাজার দিব্যদর্শনের বাসনা। যেমনভাবে যীশুর মত যুগের ঠাকুরও জন্ম নিলেন বেঁথিলেহামে। তাঁর আগমন অচেনা সুবাসের মত, জলে-কাদাগারে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের মত। কখনও তিনি আবিভাবর্ষ দীর্ঘায়ত পুরুষ, কখনও নওল কিশোর, কখনও রঘুবীর, কখনও শ্রীমতীর ভাবে পরমন্ন, আবার কখনও বা নীল আকাশের বুকে হংসবলাকা দেখে সমাধি-নিমগ্ন। তিনি সাধুর রাজা, সৈপথের নিয়ন্তা তাঁর কাছে সাধু সেবায়। নরদেহের প্রথমতম উপনয়ন বাসরে প্রথম ভিক্ষা নেন দুঃখ, দীন ধনীমার কাছে। দীননারায়ণের দরিদ্র, নারায়ণের প্রতিষ্ঠার সেই হ'ল শুরু।

নিরুপমা (শ্রীনিরুপম বন্দ্যোপাধ্যায়) পাঠ করলেন 'জননী সারদেশ্বরী।' শ্যামাসুন্দরী ও রামচন্দ্রের দিব্যদর্শনের মধ্য দিয়ে শ্রীমার দিব্য আবির্ভাব ঘটল। ঠাকুরমনি, সারদামনি দুটি নামই অপ্রাকৃত। রামপ্রসাদের আগমনী যিনি বেঁধেছিলেন এবার তিনিই আমার কুটীরে জ্বালালেন সন্ধ্যাদীপ। শিহরের আসরের দেবতা সারদা সিদ্ধিই ক'রে যেন ভবিষ্যৎ কাণ্ডারী শ্রীরামকৃষ্ণকে। যুগদেবতাও চিনিয়ে যেন তাঁর লীলা-সঙ্গিনীকে। আভরণহীনা সারদাকে দেখে ক্রুষ্ট নীলমাধব ফিরিয়ে নিয়ে যান আমার দুলালীকে। রঙ্গময় ঠাকুর বলে ওঠেন, "যাক না নিয়ে, বিয়ে তো আর ফিরবেক নি।"

সুনীলদা (স্বামী নীলানন্দ) ব্যাখ্যা ক'রে চললেন 'মেধসাশ্রম'। নামরূপের কল্পনে নীচ, হীনও মহৎ হয়। ইষ্টকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে তখনই যখন মন থেকে অহং হবে নির্বাসিত। কৃপা নিত্য, কিন্তু তা পেতে হলে মৃত্যু পণ করতে হবে ; নির্বাসনা হতে হবে। নামটি মনে গাঁথা থাকলে মহাপ্রস্থানের পথ হবে সুগম।

'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' পাঠ করলেন হীরুদা। তিনি মৃদু অনুযোগে জানালেন তাঁর জন্য কঠিন বিষয়টি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বলে। কিন্তু তাঁর পাঠ ও ব্যাখ্যা এত মনোজ্ঞ ও সরস হয়েছিল যে তা সকলেরই অন্তর স্পর্শ করল। জড়তা ও দুর্বলতাই পাপ। আমরা যেন সবরকম সামাজিক ও আত্মিক পাপের ঊর্ধ্বে উঠতে পারি। অসৎ বিনাশশীল, সৎ অবিনাশী। আমাদের সূক্ষ্ম অংশ অবিকৃত, স্থূল অংশটি শুধু বিকারপ্রাপ্ত হয়। আত্মা অবিনশ্বর। ঈশ্বর নিত্যবস্তু। আত্মা ও পরমাত্মার ভেদ আছে অথচ নাই। স্থূলের দ্বারা সূক্ষ্মের বিচার সম্ভব নয়। আমাদের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক যুদ্ধ করতে হবে।

পাঠ চলাকালীন একটি প্রশ্ন রাখলেন বিমলদা। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এমন একটি যুদ্ধে অর্জুনকে অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করছেন যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাবে। এই চরম নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা কি অহিংসার বা মানবিক গুণসমূহের বিরোধী নয়। এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যেন পরবর্তী শ্লোকগুলিতে

এবং আমাদের ঠাকুরের অপূর্ব ভাষ্যে। স্ব স্ব প্রকৃতি ও গুণ অনুসারে স্বধর্ম নিরূপিত হয়। সমষ্টির স্বার্থে, দেশ রক্ষা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ অর্জুনের ধর্ম। এ যুদ্ধ ঘোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে যুদ্ধের যিনি হোতা, যিনি মূল কারণ যুদ্ধে হতাহতের পাপ তাকেই স্পর্শ করবে, অর্জুনকে নয়। সুতরাং মানবিক ধর্মের সাথে আত্মার সুস্থতা, জীবনের অনিত্যতা বিচার ইত্যাদি এবং ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণে উৎসাহ প্রদান সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সঙ্গীতে সারদা-রামকৃষ্ণ সাধক

শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ, ভক্তিরত্ন

পাঁচশ বছরেরও আগের কাহিনী। শ্রীহট্টের বহু বিশিষ্ট সাধকের আগমন হয়েছিল, পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরস্থ কৃষ্টির পবিত্রভূমি নবদ্বীপ ধামে নবদ্বীপে। আগমন হয়েছিল, ভাগবত পুরুষ জগন্নাথ মিশ্রদেবের আর অদ্বৈত বেদান্ত সাধক কমলাক্ষ দেবের যিনি অদ্বৈতাচার্য নামে পরিচিত, যাঁর সাধনপীঠ ছিল ভাগীরথীর পূর্বতীরস্থ শান্তিপুরের প্রশান্ত পরিবেশের স্থান। ঐ সকল সজ্জনের সমাবেশে লীলা করেন নবদ্বীপ বিশ্বোদ্ধার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এবং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। এ হল গৌড় বঙ্গের লীলা।

ইতিহাসের সেই পুরাতনের নবতম অধ্যায়। প্রায় সেড়'শ বছর আগে অনুরূপ লীলা রাঢ় বঙ্গের অখ্যাত পল্লীগ্রামে হুগলী আর বাঁকুড়া জেলার সংযোগ ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন শ্রীরামকৃষ্ণদেব আর তাঁর লীলাসঙ্গিনী সারদাদেবী, খড়াহীন রাঢ়বঙ্গের আমোদের মধ্যের তীরে। নিভৃত-পল্লী, জয়রামবাটী আকর্ষণ করল বেদবিদেশের অগণিত ভক্তজনকে। আকর্ষণ করল শ্রীহট্টের অনেক লীলা রসাস্বাদনকারীকে। তাদের মধ্যে একজনকেই আমরা বিশেষভাবে এই নিবন্ধে স্মরণ করব। তাঁর সাধনার অভিব্যক্তি সঙ্গীতের মাধ্যমে।

এই স্মরণীয় মহাপ্রাণ পুরুষ হলেন, শ্রীহট্ট নিবাসী ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য, জন্ম শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা সংবরণ ১৮৮৬-এর পূর্ববর্তী বৎসর ১৮৮৩ সনে। বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে শ্রীমা-সারদা অনেক ক্ষেত্রে স্বীকার করে, কলকাতায় এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানে বাস করেছিলেন। সারদাদেবীর পতিগৃহে বাস করার পরের অধ্যায়ে বাস করতে থাকেন জয়রামবাটীতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে অনেককে ভাগবতে দীক্ষা দিয়েছিলেন, মা-সারদাদেবী। তারপরে ১৯১৩-১৯১৩/১৪ পর্যন্ত অনেক পুরুষ ও নারী মা-সারদার কৃপালাভ করেন, জয়রামবাটীতে তারপরে কলকাতার বাগবাজারে মায়ের বাটীতে।

শ্রীহট্টের ত্রয়ালি গ্রামে ৺যদুনাথ ভট্টাচার্যের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন সাধক ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। শ্রীহট্ট সর্বকালের কৃষ্টির ক্ষেত্র, ইদানীংকালে বহু সন্তের আবির্ভাব ঐ পুণ্যভূমিতে। সেই পরিবেশে জন্মগ্রহণের পরে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবী আর স্বামী বিবেকানন্দের নবযুগের বাণী স্পর্শ করে ইন্দ্রদয়ালের কোমল, অন্তকরণ। সাধু-সন্তের সন্ধানে এসেছিলেন, ভাগীরথী তীরের নতুন তীর্থ দক্ষিণেশ্বর দর্শনে, আকর্ষিত হল শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের প্রবক্তা মাষ্টার মশায়ের ভাগবত জীবন ধারায়।

একদিন মাষ্টার মশায়ের পদপ্রান্তে বসে ভাগবতজীবন করার সময়ে, সেই মাষ্টারই সন্ধান দেন, তাঁর ঐ ভাগবতজীবনেরই জীবন্ত বিগ্রহ, সারদাদেবী গোপনে বাস করছেন জয়রামবাটী পল্লীগ্রামে। ইন্দ্রদয়াল, মাতৃকৃপা ধারায় অবগাহনের জন্য উপনীত হলেন সেই পুণ্য পল্লীতে ১৯১৩ সনে এবার তাঁর সাধনা "তুই যে মন কালী বলে... আর তুই যে মন সারদা বলে ..."। ফিরে গেলেন, শ্রীহট্টের গ্রামে, আর ছেলেরা মাষ্টারের মতো অনেক

ছেলেকে বরেন ঘুরালি আর অউগ্রাম স্কুলের শিক্ষকরূপে। সাধনার জীবন, অদ্ভুত জীবন! নিজের ভাবে গান রচনা করছেন, আর সুর-সংযোগের জন্য ডাকছেন কুমুদ গোস্বামীকে। গানের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা, ইন্দ্রলাল আর সুরকার কুমুদ। সেই অভূতপূর্ব গানের একটি (ভৈরবী সুর)।

"মলয় সমীরে ভেসে আসে কি মধুর গীতি লহরী। পাপ তাপ ভরা এ মলিন ধরা ধার্য কলুষময়।
চল দেখে আসি উথলিছে যিনি কোটিশশীরূপ মাধুরী। এই মরুভূমে বৃষ্টি এল নেমে সিঞ্চিতে প্রেম বারি।
রূপ হীন কায় ভূষিবারে হায় সাধনা করি কঠোর। কে আর অমল ধবল নীরস ধার্য মোহেতে ভুলিয়া।
কোন দেবতায় আনিলা ধরায় নন্দন বন বিহারী। (আজ) প্রেমের দীক্ষা ত্যাগের শিক্ষা লহ আপন পাসরি।"

ইন্দ্রলালের এই প্রকার সঙ্গীতের ইন্দ্রজালে নিজের মধ্যে নিজেই আবদ্ধ রইলেন না। মাতৃ করুণায় অন্তর বাহির শুদ্ধ, ইন্দ্রলাল কর্মত্যাগের শিক্ষাগ্রহণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ত্যাগব্রতীদের কাছে গমন নিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা, কৃপার বৈরাগ্যবান ভক্তরাই স্বামীজীর পতাকা বহন ক'রে চলেছেন দেশ-বিদেশে। অতীতকালে যে রকম বয়সে "বলং ব্রহ্মচর্য" বা কর্মত্যাগের আদর্শ ছিল এই পুণ্যভূমিতে। সে রকম বয়সে ১৯২১ সনে, ত্যাগের দীক্ষা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন তৎকালীন, সঙ্ঘাচার্য শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর কাছ থেকে। এই ব্রতগ্রহণ বা আচার্য পদাশ্রয় ব্যাপারে ইন্দ্রলাল শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে, ব্যতিক্রমদের মধ্যে অন্যতম। সন্ন্যাস গুরুকৃপায় ইন্দ্রলালের নাম হয় প্রেমেশানন্দ স্বামী।

আমরা সারদা-রামকৃষ্ণ সঙ্গীতকারী প্রেমেশানন্দজীকে, বেলুড়মঠে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

প্রেমেশানন্দ স্বামী, সদ্গুরু শ্রীমৎ শিবানন্দজীর দেহত্যাগের পর (১৯৩৪) পরবর্তী আচার্য শ্রীমৎ অখণ্ডানন্দ স্বামীর সেবক এবং সেক্রেটারীরূপে মুর্শিদাবাদ সারগাছী রামকৃষ্ণ আশ্রমে সাধন ভজন এবং সঙ্গীত রচনায় জীবন উৎসর্গ ক'রে মাতা-সারদা পদে বিলীন হন পরিণত বয়সে ১৯৫৬ সনে বারাণসী ধামে।

সঙ্গীত-সাধক প্রেমেশানন্দ স্বামী শ্রীমা-সারদার কৃপাসিন্ধু উজ্জ্বল মণি।

—):০:(—

শ্রীআশালতাপুরীর মহাপ্রয়াণ

প্রখ্যাত লেখিকা শ্রীমতী আশালতা সিংহ যিনি পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের নিকট দীক্ষা এবং পরে শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেবের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীআশালতাপুরী নামে পরিচিতা হন। তিনি ভাগলপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বাশ্রমে বাঙ্কিপুর গ্রামে ডাঃ বিজেন্দ্র নাথ সিংহের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর এক কন্যা ও এক পুত্র বর্তমান বাংলা সাহিত্যে বহু পুস্তক রচনার দ্বারা মহিলিকা রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। দিঘিড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের মুখপত্র 'ভাবমুখে' পত্রিকাতেও তাঁর বহু মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হয়। এক সময় তিনি ভাবমুখে পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে সাঁইথিয়ার বিশিষ্ট ভক্তপুরে যোগানন্দ মহারাজের অবস্থানকালে আশালতাপুরী মা তাঁহার দর্শনার্থে তথায় গমন করেন। সেখানেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দুর্গাপুরে তাঁর ছেলের কাছে নীত হন। দুর্গাপুরে নার্সিংহোমে কিছুদিন রোগভোগের পর গত অক্ষয় তৃতীয়ার দিন পূণ্য লগ্নে বাহ্যিক লোকে মহাপ্রয়াণ করেন। প্রার্থনা করি শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর আত্মীয় পরিজনদের প্রাণে শান্তি দিন। ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণ শুভমস্তু।

সম্পাদকীয় নিবেদন

(৬৪ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবময় শ্রীঠাকুর সন্ধানেশ্বরের এই যুগদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবরাশি মানুষের মধ্যে প্রেরণা রূপে যাতে কাজ করে তারই জন্য ভাবমুখের বিভিন্ন রচনায় সেই চেষ্টা করতে চেয়েছেন। ছোট হলেও, হলেও এই পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন আছে। শ্রীঠাকুর চাইতেন, মানুষের চেহারা ঘরে যারা আসি, তারা যাতে সত্যিই মানুষ হয়ে উঠি। ভাবমুখের পাঠকগণ এটা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন। শ্রীঠাকুর আরো চাইতেন, মানুষের মধ্যে মানবিক প্রশ্ন জাগুক। শাস্ত্রপাঠের আসরে আমরা দেখেছি, শ্রীঠাকুর সকলেরই কোনো প্রশ্ন সম্বন্ধে বক্তব্য শুনতেন এবং আলোচনা করতেন। প্রশ্ন জাগে, দ্বন্দ্ব জাগে, সমাধান খুঁজে বেড়াই বলেই আমরা মানুষ। কিন্তু মাঝে মাঝে ভারত সমাজে যে সব সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে মনতে হচ্ছে করে, শ্রীরামকৃষ্ণের উদার সমন্বয়মুখী ভাবধারার আরো প্রসার অতি দ্রুত প্রয়োজন—নেতৃবৃন্দের মনে, শিক্ষিত সমাজে, শুধু বুদ্ধিজীবী সমাজ নয়, শ্রমিক কৃষক সমাজে, অশিক্ষিত সমাজেও এবং বিশেষতঃ যুবশক্তির মধ্যে।

প্রার্থনা করি, 'ভাবমুখের' বহুমুখী রচনার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারার আলোকে সত্যিকারের মানুষ হ'বার প্রশ্নগুলি আপামরের এই অভিযান চলুক, কারণ, চারিদিকে ধর্ম নিয়ে এতো সরব হৈ-চৈ, দলে দলে তীর্থ-যাত্রার হিড়িক, উৎসবের মাতামাতি, গুরু পন্থীর সভা সমিতি, কোরাস প্রার্থনার প্রাবল্য, হাজারো ধর্মপিপাসাদের আবির্ভাব, লক্ষ লক্ষ শিষ্যের লক্ষ লক্ষ টাকার প্রণামী সত্ত্বেও সাধারণের মনে অসরলতা, অসন্তোষ ও অশান্তিটা সমাজকে কুঁরে কুঁরে খাচ্ছে। ভাবমুখের মাধ্যমে এ প্রশ্ন আলোড়িত হোক—সব আবরণের আপাত—সত্যিই কি ধর্ম আমাদের চিন্তায়, আবেগে, ব্যবহারে, কাজে কর্মে প্রকাশিত হচ্ছে? কেন দেবস্থানে প্রার্থনা করার সময় 'আমি' যে মানুষটা বোধ দিচ্ছি, আমার অন্য কাজকর্মে সেই আমিই একেবারে একটি পরম স্বার্থপর, অসন্তুষ্ট, হঠকারী 'আমি'তে পরিণত হই? কেন চলবে ধর্মান্তর করবার এই মারাত্মক অন্ধ প্রচেষ্টা? কেনই বা ধর্মের নামে মানুষে মানুষে এই বিচ্ছিন্নতা? যে যুবশক্তির ওপরেই সমাজের নির্ভর করার কথা, সেই যুবশক্তি কেন প্রথাকবিদ্ধ ধর্মীয় হুজুগ, রাজনীতির দলাদলি, সভ্যতার আধুনিক ভয়াবহে আমদানী করা নেশায় শরীর ও মনটাকে ডুবিয়ে শক্তিকে ঝিমিয়ে রাখার সূক্ষ্ম ও নিষ্ঠুর কৌশলের শিকার হয়ে চলবে? ধর্ম যে ঈশ্বর, আল্লাহ্ বা গড্-এর উপলব্ধির সাধন পদ্ধতি—এই সত্যটা ভুলিয়ে দিয়ে, কেন মানুষকে জন্ম থেকে বাপ মেরে ভুলিয়ে দেওয়া হবে যে, সে একজন মানুষ? কেন শুধু সে এইটা জেনেই বড় হবে যে, সে মানুষ হোক বা না হোক, সে একটা বিশেষ ধর্মের সদস্য মাত্র এবং অন্য ধর্মের লোকেরা তার বন্ধু নয়? প্রার্থনা করি, 'ভাবমুখে' মানুষকে বুঝতে সাহায্য করুক, যে মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতার মূলে যে নিষ্ঠুর কৌশল কাজ করছে—সেটা বিবেকের নয়, সুবিধা-বাদের, সেটা প্রাণের প্রকাশ নয় গোঁড়ামির, সে আবেগ অন্তরের নয়, দখলদারীর উন্মত্ততা, সেটা ভালবাসা নয়, শুধু ভয়, এটা মনুষ্যত্বের বিকাশ নয়, তার পূর্বতন অবস্থায় ফিরে যাওয়ার রাস্তা মাত্র।

পাকঃ পৃচ্ছামি*

গৌরী ধর্মপাল

কার আলো গায় মেখে বিষম বিবস্বান্ ?
(বিষস্ —)
কার চোখে চোখ রেখে নিশীথিনী ভাস্বান্ ?
(গায় গান)
কার আলো পাক খায় উল্কা-জ্যোতিতে ?
বল্ তোরা কেউ যদি কোথা সে জানিস্ কে।
সূর্য উষা না পূষা বল্ না কী নাম তার।
কে রাজার জারণীরে আনিল ইনামদার।
(রাজগীর-জারণীরে)
(অপজ্ঞনক-সূনু)
আকাশ বিকাশ পেল কার মুখে রেখে মুখ।
স্বচক্ষে দেখেছিল কে তুই আহাম্মুক ?
(বিনা-চশমায়, বল্)
আঁতুড়ে অজাত্ ছেলে কোলে নিয়ে কোন্ মা
হাপুস নয়নে হাসে সার্থকম্মা ?
ওহায় আঁধার ঠেলে কোন্ বাধা সারাদিন
নিমীলিত চোখ মেলে আগলায় মহাত্তিম ?
বুঁচো হাত নেড়ে নেড়ে বর্ষায় বৃষ্টি ?
(বেড়ে বেড়ে)
সৃষ্টিটা স্বপ্ন ? না, স্বপ্নটা সৃষ্টি ?

• • •

বিশাল বাগান-বাড়ী থাকতেও দিন কাটে
পথে পথে কার বল্ দিন্-গাঁটে, দিন্-বাটে ?
দরজায় দরজায় ঘিরে যারে বজ্জাত
যখন তখন খুশি বল্ কোন্ বীণকার ?
(যখন খুশি তখন নবীন কে বীণকার ?)
নীলিমায় লাল-নীল ঢিল কে সে ছুঁড়ছে ?
(বল)
সুন্দরী কোন্ বুড়ি চড়া রোদে পুড়ছে ?
বসে বসে লেখে আর কাটে জোড়ে প্রশ্ন—
কে সে কবি অনন্ত-সমুদ্র-মন্থ ?
গুহা থেকে মহাকাশ উঠে গিল কার হাত ?
কার দশ, কার আট, কার ছয়—চার হাত ?
কে সেই অ্যালবাট্রস্[১]—তাক দিয়ে ক্রুদ্ধে
বঁড়শি-ভাঁপ খাঁড়া-ভাঁপ দিয়েছে সমুদ্রে ?
নির্ঘণ্টির বুক চিরে তুলেছে কী রত্ন ?
স্বপ্নটা সৃষ্টি ? না, সৃষ্টিটা স্বপ্ন ?

মশান-শ্মশান-ময় আজ মস্তার দল
ভৈরব রব দেয়, আগে চল্, আগে চল্।
অন্ধকারর্ণবে চিহ্ন-হীন দিক্-দিশা
(অন্ধকার-বিলীন)
ঘুমন্ত অজগরী কোজাগরী মহানিশা।
ইঁদুর বুলিয়ে হাতে চলেছে বিপন্থক[২]
চাপাভাঙা চিরিমিরি চাহিল গাংচেক
স্মরণচিহ্নহীন ভেসাখা চৌরাস্তায়—
জেষ্ঠী তুমি কোথায় ? জেষ্ঠী তুমি কোথায় ?
মহাবল ফিরে যাও, ফিরে যাও, মহাজন—
মরণ জীবন কেন ? জীবন কেন মরণ ?

---

* পাকঃ পৃচ্ছামি মনসাবিজানন্ ঋগ্বেদ ১।১৮৪।৩]
কাঁচা মন, কিছু জানি না, শুধোই।

১। কোলরিজের Ancient Mariner-এর পাখি। এখানে মৃত্যুগ্রস্ত প্রাণের প্রতীক।

২। পন্থক আজকের বুদ্ধিমান কিশোর বণিক, মরা ইঁদুর মূলধন থেকে লাখপতি।

বিপন্থক—পন্থকের বিপরীত, খোলাবো ইঁদুর মৃত্যুগ্রস্ত প্রাণের প্রতীক। অনন্য পথচারী শিল্পী, শিল্পের খেলনায় মরাকে দোলা করেছে, কিন্তু জীবন জিজ্ঞাসার শেষ নেই।

Bengal Down The Ages

Prof. Kausambi Nath Mallik

[*Continued from the previous issue*]

Regeneration of Bengal
(Bengal regained her last glory)

Bengal played a prominent role in the history of Indian Culture in the early and middle ages. The Muslims conquered Bengal no doubt, but they could not conquer the culture of Bengal, rather they enriched it further. By the end of the middle ages and at the beginning of the British rule Bengal seemed to forget what she had been. Then came Rammohon, Vidyasagar, Sri Ramkrishna, Bankim Chandra and a host of others and came English education. Bengal regained her lost glory in the early twentieth century. Bengal was reborn.

Swami Vivekananda : (1863-1908 Swami Vivekananda, the chief disciple of Ramakrishna, was really a force in the history of modern India. Born in a reputed family in 1863, Narendranath was fearless even in his childhood. He showed preference for truth and religion. When he was in the college he was thinking of meeting god. None could satisfy him. At last he found the answer in Sri Ramakrishna and became his disciple. After twelve years of *sannasi life* he became famous as Swami Vivekananda, the apostle to the world of his guru s, philosophy of god-realisation. After the death of the guru, Vivekananda travelled all over India and saw how poor were Indian people. He realised, service of god lay in the service of poor people. Later he began thinking and working in this line. He went abroad to preach Indian religion and culture and addressed the First World Parliament of Religions at Chicago in 1893. After four years of lecturing in America and England he returned to India a national hero and took up the task of regenerating his fellow-countrymen. He burned himself out in their service. He founded the Ramakrishna Mission at Belur to serve the people. It was dedicated to both social work and religions education.

Though a religious preacher Vivekananda never forgot his land and people. He gave a call to worship the land as mother, to treat the common people as brothers and sisters, to sacrifice life for the cause of the country.

Although he died at thirty-nine, Vivekananda's example had influenced the youth verymuch. His success in preaching to the world the greatness of Hinduism gave us an added sense of dignity and pride in our own culture. His zeal to serve the poor and the downtrodden masses opened a new sphere of activity to our political leaders. Gandhiji acknowledged his debt to the Swami in respect.

Sister Nivedita : Miss Margaret Nobel met Swami Vivekananda in 1890. This meeting brought about a change in her life. She took a religious order and was transformed into 'Sister Nivedita'.

Sister Nivedita was not only a religions soul. She also thought of making her new homeland India free from the British. She kept contact with the Anushilan Samiti and took part in the movement opposing partition of Bengal. She taught people to get rid of anything foreign. Even she helped the revolutionaries in various ways. She also drew the attention of the young Bengali artists to the ancient Indian Art which was so rich in quality.

The life of Sister Nivedita should be an object lesson for us all for her devotion, selflessness, patriotism and love for the people.

[*To be continued*]

God, Ditto and Doubt

Sri Asit Biswas

'Here god came just a few hours back, but you are unlucky enough not to have availed yourself of His divine presence.' 'Oh, no, He is right present here and bestowing His perennial mercy, but you are unfortunate in that you are taking Him for an ordinary man, only want to a claster of peculiar habits, often rituals'. While such statements constantly pour in to confound a spiritual aspirant, there is a host of others that may sound heretic, adding vigorously to his confusion and despondency. 'Those so-called god-men of old are but the greatest champions of ethics and humanity, of equality and social justice, and later supernaturel powers were attributed to them by a credulous posterity, and legends were contrived to that effect.' 'The godmen of cowparatively modern dates again fought out superstitions and erased socio economic blemishes of their age to make this world a better habital for all. They were actively linked up with what you call Renaseence.' But these pseudo-rational contentions seem to be very In adequate as interpretations, holding out all along painful hazards to a seeker trying to arrive at just the truth. There is again no dearth of imposters and humbugs, upstart crows and veritable wolues with a Lamb's coat, and again men in millions must remain amazed before some living prominent figures who crave limelight, allow themselves to be proclaimed as great artists of miracles and sole agents of spiritual dole, who know well when to retreat into an envelope of mystery and awe, denying the least intimacy to the genuine, hungry aspirants The seekers's path is strewn with thorns of doubts and foul play, it is sharper than the razor's edge, as the Gita told us. Books of philosophies are grave hardware shops of heavy materials when you need a needle or a pin to take out the thorn your groping palm is inflicted with.

I am so long running the risk of being introduced as a chap who is bent upon

Inviting haze and maze to a sphere where god-loving men throng with desperate faith. But faith withers even as the petals drop out or an incense stick burns itself or as a guarded candle flame is blown by a puff of wind. But faith is always blind, never gifted with an eye, said Sri Ramakrishna. By using this brilliant figure of speach whether he advocated or apposed the case of faith, it is difficult to say. A learned invigilator is allow d only to smile at the tragic error's flooding the examinee's answer script ; hardly can he, though merciful, intervence with a corrigendum. Maybe, likewise the hands of a saviour are tied.

This is how faith and doubt alternate, and cheap hopes and assurances must be at war with reason and reality unless one is persuaded to take a tooth brush for a chip of sandal wood. There we find a sort of helpless people who show a rare power of endurance in the midst of several eross-currents, and I am reminded of those patients who are unusually patient even when a prolonged course of medical treatment miserably ails. Indeed years of religions ptactices rigorously observed may prove altogether unavailing ; if the practising man has a wrong understanding of God, and the 'sadhana' or a wrong selection of the Guru. Formal and undiscriminating initiations can offer little aids, if the preceptor is not concerned with a consuming anxciety to serve the fallen men with the right sort of spiritual diet.

Out age is characterised by sweeping fashions, fickle fun and smart stants. Hurries renew themselves, and worries multiply. But the search for the highest human attainment requires as a pre-condition a Promethean reserve of patience, unflinching tenacity and unshaken optimism. For soul searching in the name of the business, where the individual ego is the price and eternal communion with the Infinite Bliss is the proceeds. Here none is a fortunate passanger, everyone is a hardy pedestrian. He is to weigh everything that comes his way in the shape of aids, dues and charity, for he is a ruthless challenger, taking for granted nothing but his stout common sense a sense which appropriately entertains all human humours the discriminating faeulties not without proper concessions at times for human frailty. Thus an artist and a spiritual seeker have many things in common, and both undergo almost a similar process of trials and tribulations.

In such a true seeker of Truth the history of the whole human race is thus enacted, though in a nut-shell, once again and the conflicts of the great masters of old are repeated in him. For the evolution of man, so far attained must be more or less an intimate and individual experience for the aspirant himself. He is to cover a vast tract of the existent wisdom, but this time with a speedy vehicle of intellect. He is to sort out his own method which may appear at the outset to be an individual prescription and yet must in the end prove to be universal. For the highest spiritual experience is one, uniform and not varied, and the divergent paths to attain if must at one point converge into a single royal road.

Let us ask ourselves whether we are content with our mundane plane of existence, with the gifts of those five senses and the unbroken chain of alternating weal

and woe associated with them with the unravelled mystery of our own pathetic existence If so, then adieu to god. If no, then we must be on our guard against all the mists of misconceptions shrouding the face of God. And here we must prefer the ways of a geologist to a those of a ball which too casually digs the earth with its pair of horns. So we must not flout ditto and doubt and judge the utility of each in our spiritual pursuit. We cannot wholly bank on the spiritual wealth of the world handed down to us by way of a legacy unramilting reasoning coupled always with an amount of adventurism must be employed to test the verity of the prevalent facts about religion. Photography, tape records and the printing machines on the one hand, and easy international communications and a cultural confluence on the other, make the biographies of the seges of our century all the more realistic and convincing. Many things and anecdotes of the medieval hagiographies are today challenged by a bold enquirer. So more caution is to be adopted to keep up the dispassionate objectivity in the accounts of the saints. Happily some such accounts are now available. For we cannot forget that the role of both eyes is immense and even incalculable in opening out the third eye. These eyes will again be closed in all humility as and when direct experience of god reveals itself as in the Viswarupa-darsana-yoga chapter of the Gita, and the Sadhaka will utter with folded hands : Sakheti matwa prasabham yaduktam...'.

—:o:—

Memories of History

Sri Jyotsna Nath Mallik

Long long ago I read the history of England.
Most of its tales have forgotten since.
But for ever is carved in my heart,
Secretly murdered that pair of prince.

What in a far off land. In some distant age.
The cruel kaling that took place,
Only the two young faces keep awake In my heart
Great England vanishes without a trace.

Alas I have forgotten nearly the history of India too.
Many a kingdom gone. advant of many a race
In the ocean of tears everything is drowned
Remains flosting alone Somnath the sacred place.

The destruction of temples is nothing new,
The sacking of Chitors is not less sore,
But Somnath alone pervades my heart
With some unbeereble sorrow for ever-more.

The Kerbala of Arabia or the great cremation ground,
On Forat's shores my heart roams and sighs,
All around I hear cries of 'Hossain', 'Hasan',
All waters get lost in the tears of my eyes,

I cannot understand which is the greatest,
All these equally pull my mind.
It is not love but what a stranger type ?
It is feeling making whole world mine I find.

Translation of Kumudranjan's poem 'Itihaser Smriti' at P-179 of 'Kumudkabya Munjusa' by Sri Jyotsna Nath Mallik.

'SAFEX' LAMINATED SAFETY GLASS
TOUGHENED GLASS
"TWINBIRD" MIRRORS ETC.

Manufactured by

Hindusthan Safety Glass Works Private Ltd.

2, ST. GEORGE GATE ROAD, HASTINGS,
CALCUTTA-22.

Gram PHONE : 45-0125 (3 Lines)

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের পুস্তকাবলীর কয়েকটী

যুগে যুগে যার আসা—(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবজীবনের ও সাধনমার্গের এক অপূর্ব জীবনালেখ্য) টা. ১২·০০

যুগাচার্য— (শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের জীবনবেদ অবলম্বনে জীবনী গ্রন্থ) টা. ৬·০০

বেদছন্দা— (শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের অমৃতবাণী সঙ্কলন—৫ খণ্ড একত্রে) টা. ৭·০০

কথামৃত-কথা (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের কিছু বাণীর আধুনিক যুগসম্মত ব্যাখ্যা) টা. ৮·০০

জপ-ধ্যান— (জপ ও ধ্যানমার্গে অধ্যাত্মসাধনার সহজ নির্দ্দেশ) টা. ৬·০০

Complete Works— (In Eigth Volumes) Rs. 150·00

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২, পি. কে. সাহা লেন,
কলিকাতা-৭০০০৫৬ ফোন ৫২-৭১৩৩

Regd. No. WB/NC-[illegible] * BHABMUKHEY * Phone 52-7133

With Best Compliments Of

Gram : COKEOVEN, CALCUTTA
Telephone : 24-4492, 24-5980

INDIA POTTERIES LTD.

Manufacturers of :

Electrical Insulators upto 33 kv range as per I.S. Specification

And

Quality Tableware, 'India' Water Filter, Filter Candles, Figures, Dolls, Toys, Industrial Ceramics Etc. Etc.

Factory :
8, Nilgunj Road, Belgharia,
Calcutta-700056
Phone : 68-1198

Office :
91, Dharmatala Street,
Calcutta-700013

14 JUL 1993

প্রচ্ছদপট পরিচিতি :—হুবরাজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের নবনির্মিত মন্দির

পত্রিকা সচিব—স্বামী পরমানন্দ। সম্পাদক—স্বামী অরূপানন্দ ও স্বামী নীলানন্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২নং রামকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬ হইতে প্রকাশিত ও শারদানন্দ প্রেস, মহাবিদম ষষ্ঠ, কলিকাতা-৩৪ হইতে মুদ্রিত (ফোন : ৩২-৩১৭১)। মুদ্রাকর ও প্রকাশক—স্বামী পরমানন্দ।

প্রতি সংখ্যা : এক টাকা পঁচিশ পয়সা মাত্র। বার্ষিক মূল্য : চৌদ্দ টাকা মাত্র।